শুকতারা

বাহাদুর বেড়াল

ষট্‌চত্বারিংশৎ বর্ষ
একাদশ সংখ্যা
পৌষ • ১৪০০

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস' প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী,রমন, বিল্লু, পিঙ্কী, আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন এবং আকর্ষণীয় কান্ডকারখানা।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার প্রধান সাহায্যকারী। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর সমস্যা-গুলোর সঙ্গে অনবরত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আনন্দও দিয়ে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের অদ্ভূত চরিত্র রমন। পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত হাসিতে ভরপুর রমনের নতুন কমিকস্।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি পিঙ্কী ওর দাদু আর ঝপটজীকে সঙ্গে নিয়ে অদ্ভূত-অদ্ভূত কান্ডকারখানা করে তোমাদের তো বটেই, অত্যন্ত গোমড়া-মুখোদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু ওর সঙ্গীসাথী গান্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ানকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য বুকষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জক। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু এবং অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত ফ্যান্টমের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক্।

ডায়মন্ড কমিকস্-এর নবতম নিবেদন

ব্রহ্মান্ডের অধিপতি 'হী-ম্যান' এখন বাংলাতেও ডায়মন্ড মিনি কমিকসে প্রকাশিত হয়েছে!

সংখ্যা ঃ 1-12

প্রতি সংখ্যার মূল্য ঃ 3/-

বিশ্ববিখ্যাত কমিকস্ 'স্পাইডার-ম্যান' এখন বাংলাতেও! সংখ্যা 1-2 স্টলে হাজির হয়ে গেছে।

মূল্যঃ 8/-

স্টীকার ফ্রী

DIAMOND COMICS (P) LTD.

2715, Darya Ganj New Delhi-110 002.

DISTRIBUTORS **VISHAL BOOK CENTRE** 4 TOTTEE LANE CALCUTTA-16

বাঁটুল দি গ্রেট

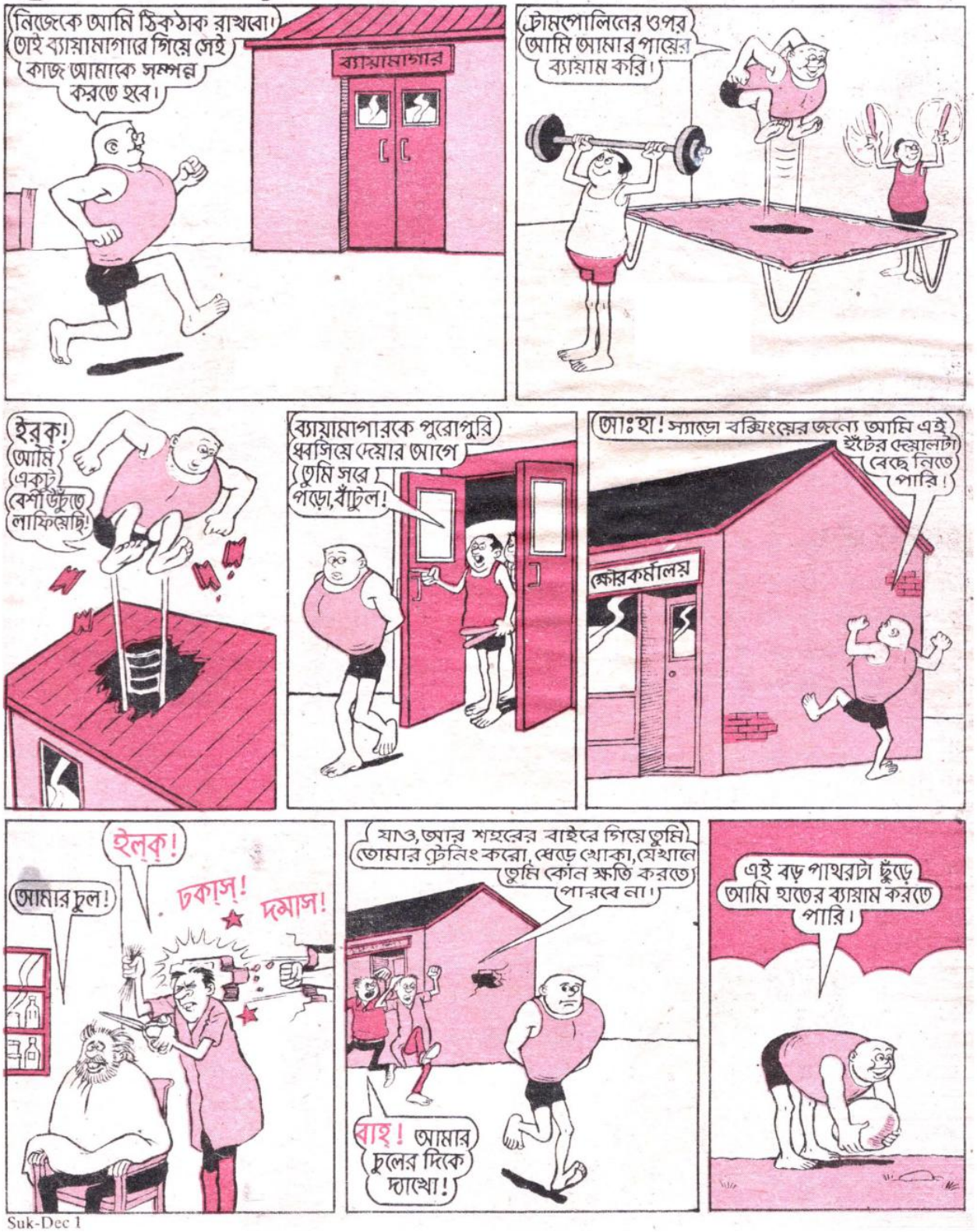
নিজেকে আমি ঠিকঠাক রাখবো। তাই ব্যায়ামাগারে গিয়ে সেই কাজ আমাকে সম্পন্ন করতে হবে।
ব্যায়ামাগার
ট্রামপোলিনের ওপর আমি আমার পায়ের ব্যায়াম করি।
ইরুক! আমি একটু বেশী উঁচুতে লাফিয়েছি!
ব্যায়ামাগারকে পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দেয়ার আগে তুমি সরে পড়ো, বাঁটুল!
আঃহা! স্যান্ডো বক্সিংয়ের জন্যে আমি এই ইঁটের দেয়ালটা বেছে নিতে পারি।
ক্ষৌরকর্মালয়
ইলুক!
আমার চুল!
ঢকাস্!
দমাস!
যাও, আর শহরের বাইরে গিয়ে তুমি তোমার ট্রেনিং করো, ধেড়ে খোকা, যেখানে তুমি কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
বাহ্! আমার চুলের দিকে তাখো!
এই বড় পাথরটা ছুঁড়ে আমি হাতের ব্যায়াম করতে পারি।

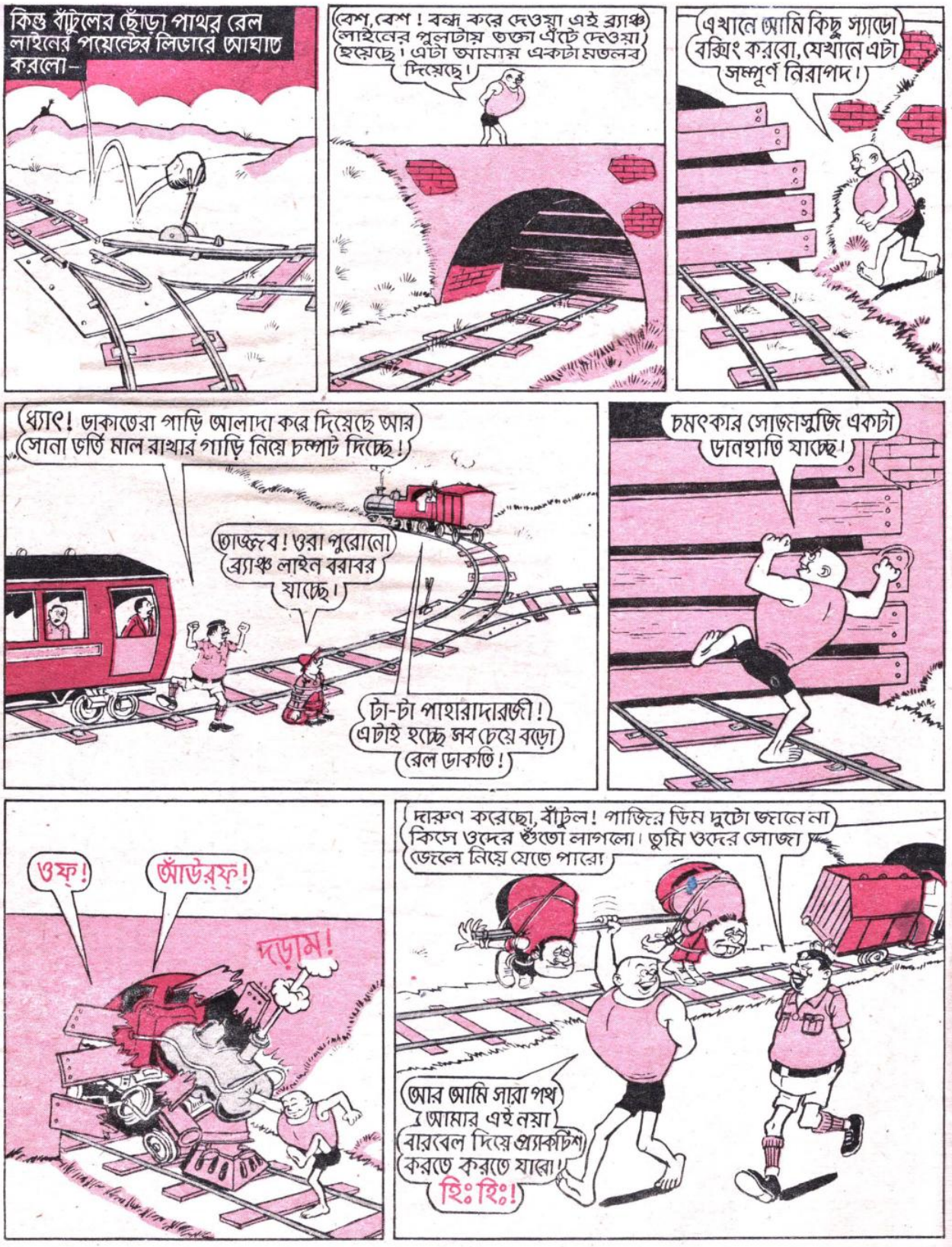
কিন্তু বাঁটুলের ছোঁড়া পাথর রেল লাইনের পয়েন্টের লিভারে আঘাত করলো–
বেশ, বেশ! বন্ধ করে দেওয়া এই ব্র্যাঞ্চ লাইনের পুলটায় তক্তা এঁটে দেওয়া হয়েছে। এটা আমায় একটা মতলব দিয়েছে।
এখানে আমি কিছু স্যাডো বক্সিং করবো, যেখানে এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।
ধ্যাৎ! ডাকাতেরা গাড়ি আলাদা করে দিয়েছে আর সোনা ভর্তি মাল রাখার গাড়ি নিয়ে চম্পট দিচ্ছে!
তাজ্জব! ওরা পুরোনো ব্র্যাঞ্চ লাইন বরাবর যাচ্ছে।
টা-টা পাহারাদারজী! এটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো রেল ডাকাতি!
চমৎকার সোজাসুজি একটা ডানহাতি যাচ্ছে।
ওফ্!
আঁউরফ্!
দড়াম!
দারুণ করেছো, বাঁটুল! পাজির ডিম দুটো জানে না কিসে ওদের গুঁতো লাগলো। তুমি ওদের সোজা ভেলে নিয়ে যেতে পারো
আর আমি সারা পথ আমার এই নয়া বারবেল দিয়ে প্র্যাকটিশ করতে করতে যাবো!
হিঃ হিঃ!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

পৌষ ১৪০০
ডিসেম্বর ১৯৯৩

প্রচ্ছদ □
বাহাদুর বেড়াল—নারায়ণ দেবনাথ

শ্রদ্ধাঞ্জলি □
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ
— স্বামী মুক্তিকামানন্দ ৫০

ধারাবাহিক □
অমাবস্যার রাতে (রহস্য উপন্যাস)
— শিশিরকুমার মজুমদার ২১
অরণ্যপতি টারজান
(অ্যাডভেঞ্চার)—সব্যসাচী ৪০

সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী □
রাম-লক্ষ্মণ—মঞ্জিল সেন ৩০

গল্প □
মিস্ট্রি—অপূর্ব দত্ত ৯

হাসির গল্প □
কবিতার কেরামতি
— শৈবাল চক্রবর্তী ১১

অনুবাদ □
ভাল কাজের ফল পাবেই
— অসীম চৌধুরী ৬৩

রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী □
ট্রেন-ডাকাতের ওভারঅলস্
— শ্রীধর সেনাপতি ৬

পুরস্কৃত গল্প □
শ্রাবণ সন্ধ্যায় (প্রথম)
— দীনবন্ধু বসু ৬৬
বৃষ্টিঝরা দিনে (দ্বিতীয়)
— মহুয়া সাহা ৬৭

জীবন থেকে নেওয়া □
ফ্রেডির জন্যে—আরতি বসু ৭০

ফিচার □
ডাকটিকিটে কত কি
— কবিতা রায় ২০
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ১৪
ভবিষ্যতের ঠিকানা
— পদ্মা চৌধুরী ৪৩
মজার খবর—বরুণ মজুমদার ৪৭

বিশ্ববিচিত্রা □
জিজ্ঞাসা ৬৫
সত্যি! ৬৯

অনিবার্য কারণবশত এই সংখ্যায় স্বর্ণখনির অন্তরালে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

কবিতা □
কর্মবীর—প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় ৫
মনের কথা—দেবাংশু চক্রবর্তী ৮

বিভাগীয় লেখা □
খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩
পড়ার সঙ্গে খেলা
— কল্যাণ মৈত্র ৬১
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
— তুষার শীল ৬২
দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৪৪

ছবিতে গল্প □
যুগ যুগান্তের যাত্রী (রঙিন)
— ময়ূখ চৌধুরী ১৮
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
— নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৪৮
তিতলির যাদু-পুতুল
—পল্লব পূততুণ্ড ও
দোলা পূততুণ্ড ৩৮
ভয়ঙ্করের মোকাবিলায়
ম্যাম'জেল এক্স ২৮

ঘোষণা □
নির্মল সাহা স্মৃতি
সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৬৮
জানো কী ৪৩

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকেঃ বুক পোস্টে - ১১০টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh— **Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.— **By Sea Mail Rs. 327.00**
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দামঃ ৮ টাকা মাত্র

নিউ বেঙ্গলের অভিজাত অভিধান

আবার পাওয়া যাচ্ছে

Subal Chandra Mitra's

Dictionaries for Students and Teachers

An ideal book for learning and writinggood English

The Student's Constant Companion Pocket Bengali to English Dictionary

Price Rs. 80.00

সরল বাংলা অভিধান

মূল্য— টাঃ ২৪০·০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

শুকতারা

৪৬শ বর্ষ ● ১১শ সংখ্যা ● পৌষ ১৪০০/ডিসেম্বর ১৯৯৩

কর্মবীর

প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

ঘুমকাতুরে দারোয়ান,
দোদুল ভুঁড়ি পালোয়ান;
যখন তখন চক্ষু মুদি
জড়ায় গায়ে আলোয়ান।
উঠতে বসতে চলতে ঘুম,
দাঁড়িয়ে কথা বলতে ঘুম!
ঘুমগিরিতে বাসটি তার,
ঘুমপরী তার দেয় যে চুম।

সাঁজ থেকে তার নাক ডাকে,
নাক ডাকে না বাঘ ডাকে?
থর-থর-থর দরদালান
তখন কে আর পায় তাকে?
সেদিন তুলে বিরাট হাই,
বলল, 'কাজে কি আর পাই?
এখন থেকে মাইনে ডবল,
উপরি, ওভারটাইম চাই।'
বলতে বলতে নাক ডাকে,
নাক ডাকে না বাঘ ডাকে?

ছবিঃ অমল চক্রবর্তী

ট্রেন-ডাকাতের ওভারঅলস্

শ্রীধর সেনাপতি

অরিগনের দক্ষিণে সিস্‌কিউ পর্বতমালা। তার মাঝ দিয়েই চলে গেছে রেল লাইন। পোর্টল্যান্ডের সঙ্গে সানফ্রানসিসকোর যোগাযোগ এই লাইন। শরৎকালের পরিষ্কার একটা দিনে সানফ্রানসিসকোগামী সাদার্ন প্যাসিফিক এক্সপ্রেস ট্রেনটা এসে থামল সিস্‌কিউ শহরে। এখানে নতুন ইঞ্জিন লাগান হবে। কারণ সামনেই পাহাড়ি উৎরাই। বাড়তি ইঞ্জিন ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে। ট্রেনটা ছাড়ল। ড্রাইভার সিডনি বেটস্ গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যস্ত রইলেন। ট্রেন নির্দিষ্ট গতিতেই ছুটে চলল। ফায়ারম্যান মারভিন সেঙও ব্যস্ত ছিলেন ইঞ্জিনের আগুন নিয়ে। সামনেই বিশাল লম্বা একটা সুড়ঙ্গ। ট্রেনটা সে দিকেই এগিয়ে চলছিল।

ট্রেনের যাত্রীদের কানে ট্রেনের চাকার আওয়াজ ভেসে আসছিল। আশপাশের পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলে এগিয়ে চলছিল ট্রেনটা। বেটসের চোখের সামনে সুড়ঙ্গমুখটা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। একসময় ট্রেনটা ঢুকে পড়ল অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে। নানান বিচিত্র আওয়াজ তুলে এগোতে এগোতে ট্রেনটা প্রায় সুড়ঙ্গের অন্য দিকে পৌঁছেছে এমন সময় পেছন দিক থেকে দুজন হামাগুড়ি দিয়ে ইঞ্জিন কেবিনে ঢুকে ওদের সামনে দাঁড়াল। তাদের দুজনের হাতেই শটগান। রূঢ়স্বরে তারা বলল, 'থামাও গাড়ি।'

ড্রাইভার সিডনি বেটস্ বুঝলেন, এখন আর অন্য কিছু করার উপায় নেই। তিনি তাই গাড়ির ব্রেক কষলেন।

চাকায় বিকট আওয়াজ তুলে ঝাঁকি দিয়ে ট্রেনটা আচমকা থেমে গেল। তখন শুধু ট্রেনের ইঞ্জিন আর তার সঙ্গে পাশের মেল ভ্যানটাই সুড়ঙ্গের বাইরে বার হয়ে এসেছে। মধ্যে রয়ে

গেছে যাত্রী আর তাঁদের মালপত্র বোঝাই ট্রেনের বাকি কামরাগুলো।

পিঠে শটগান ঠেকিয়ে ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান দুজনকে নিচে নামতে বলল দশাসই একটা গুণ্ডা। নিজেদের ভাগ্যে যে কি আছে তা ভাবতে ভাবতে দুজনেই নেমে পড়লেন নিচে। ওঁদের নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হলো একটা ঝোপের পাশে।

বেটস্ দেখলেন, অন্য একটা গুণ্ডা হাতে কি যেন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ভ্যানের দিকে। ওর হাতের জিনিসটা থেকে তার ঝুলছে। লোকটা হাতের জিনিসটা মেলভ্যানের স্লাইডিং দরজার গায়ে ভাল করে আটকাল। তারপর তাড়াতাড়ি সরে এলো সেখান থেকে।

কিছুক্ষণ পরেই ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গোটা ট্রেন দুলে উঠল। বিস্ফোরণের শব্দ চারদিক কাঁপিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবার আগেই সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে ছুটে বার হয়ে এলেন ট্রেনের ব্রেকম্যান চার্লস ওয়েন জনসন। কি ঘটেছে তাই দেখতেই তিনি ছুটে আসছিলেন। গুণ্ডাদের হাতের শটগান সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল। ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ও ব্রেকম্যান তিন জনেরই প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

মেল ভ্যানটা তখন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। আগুন দেখে গুণ্ডাগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওরা এসেছিল মেল ভ্যান লুট করতে, কিন্তু এমন ভয়ানক আগুনের মধ্যে তারা মেল ভ্যানের মধ্যে ঢুকবে কি করে? এত কাণ্ড, তার ওপর তিন তিনটে খুন করা সবই ব্যর্থ হলো তাদের। আর তাহলে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে তারা কি করবে! ঘোর জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিল গুণ্ডারা।

মেল ভ্যানে ডাক গোছাচ্ছিলেন ডাককর্মী এডুইন আর্ল ডগার্টি। বেচারা তিনিও আগুন থেকে বার হতে পারলেন না। কর্তব্যরত অবস্থায় তিনি আগুনে পুড়ে মারা গেলেন।

কন্ডাক্টার জে. ও. ম্যারেট পেছনের কামরায় বসেছিলেন। গাড়িটা আচমকা মাঝপথে থেমে যেতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। সুড়ঙ্গের ওই দিকেই একটা ফোন ছিল। রেলের জরুরী কাজেই ওটার ব্যবহার করা হতো। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে তিনি ফোন তুলে অ্যাসল্যান্ডের জরুরী দফতরে ট্রেন হঠাৎ থেমে যাওয়ার কথাটা জানিয়ে দিলেন। ফোন রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানে এল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ।

তাদের সঙ্গে কুকুরও এল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওই অঞ্চলের ডেপুটি শেরিফ তাঁর দলবল নিয়ে হাজির হলেন ওখানে। শুরু হলো অনুসন্ধান। স্থানীয় একজন জানালেন ট্রেনটা যখন আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গে ঢুকছিল, তখন দুজন লোক লাফিয়ে মেল ভ্যানে উঠে পড়ে।

চারদিক খুঁজে অনুসন্ধানকারীরা বিস্ফোরণ ঘটানোর যন্ত্রটা পেলেন। পেলেন তেলকালি মাখা একটা পুরনো ওভারঅলস্ আর একটা জুতো ঢাকা দেবার কাপড়। তাতে আবার ক্রিয়োজোট মাখানো। এটা করা হয়েছে যাতে পুলিশ-কুকুর না পিছু নিতে পারে।

পুলিশ এল। তাদের সঙ্গে কুকুরও এল। ওভারঅলস্-এর গন্ধ শোঁকানো হলো তাদের। সেই গন্ধ অনুসরণ করে কুকুরগুলো পাহাড় জঙ্গল পাড়ি দিয়ে হাজির হলো একটা খোলামেলা জায়গায়। কিন্তু সেখানে গুণ্ডাদের পাত্তা পাওয়া গেল না।

এবার পুলিশকে সাহায্য করতে এলেন, প্রখ্যাত অপরাধবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ওসকার হেইনরিচ। ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে তাঁর ল্যাবরেটরি। তাঁর ল্যাবরেটরিতে এর আগে বহু বিভ্রান্তিকর অপরাধের রহস্য ভেদ করা হয়েছে।

পুলিশ ট্রেন ডাকাতির ব্যাপারে তাঁর সাহায্য নিল। অকুস্থলে পাওয়া জিনিসগুলোর সঙ্গে সেই নীল রঙের নোংরা পুরনো ওভারঅলস্টাও ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিল।

কিছুদিন বাদেই তাঁর কাছ থেকে লিখিত রিপোর্ট এল। তিনি লিখেছেন, একজন ন্যাটা কাঠুরে বা করাতির ওভারঅলস্ ওটি। তার কাজ পাইন জাতীয় কাঠ নিয়ে। সে শ্বেতাঙ্গ। বয়স একুশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। ওজন ১৬৫ পাউন্ডের মতন। হাত-পা ছোট আকারের। ব্যক্তিগত ভাবে সে কিন্তু বেশ রুচিবাগীশ। থাকে প্যাসিফিক নর্থ ওয়েস্টে। কাজকর্মও সেখানেই করে। এরপর তিনি লিখেছেন এ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য তিনি পরে জানাবেন।

পুলিশ আর রেলের গোয়েন্দারাও চুপ করে বসেছিলেন না। তাঁরা নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হেইনরিচের সঙ্গে দেখা করলেন।

কিভাবে হেইনরিচ তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সে কথা তিনি ওঁদের বুঝিয়ে বললেন, 'ওভারঅলস্-এ পাইন কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে। ডান পকেটেও তেমনি গুঁড়ো। ওগুলো ডগলাস পাইন গাছের গুঁড়ো। ও গাছ একমাত্র নর্থ ওয়েস্টেই পাওয়া যায়। লোকটার চুলের রংও জেনেছি কারণ ওভারঅলসের বোতামে একগাছা চুল জড়িয়েছিল। যেহেতু ওর ডান পকেটেই কাঠের গুঁড়ো বেশি, তাই বুঝেছি ও ন্যাটা। আর লোকটার জামার পকেটে নখের আঁচড় পড়েনি দেখেই বুঝেছি ও বেশ রুচিবাগীশ। নিয়মিত নখ কাটে। লোকটা বাঁদিকের পকেট বেশি ব্যবহার করত। জামার বোতামও বাঁ হাতে আঁটত। ও যে শ্বেতাঙ্গ তা বুঝছি ওর চুলের ক্রশ সেকশন মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করে। লোকটা ককেশিয়ান শ্বেতাঙ্গ। আর ওই চুল থেকেই বোঝা গেছে ওর বয়স।'

কথার শেষে উনি বললেন, 'ওভারঅলসের সরু পেন্সিল পকেট থেকে আমি একটা রেজিস্টার্ড মেলের রসিদ পেয়েছি। তার নম্বর ২৩৬২।'

ওই নম্বর ধরে খোঁজ করে জানা গেল, ইউজিন, অরিগন থেকে রয় ডি' অট্রিমন্ট নামে একজন লোক লেকউড নিউমেক্সিকোয় টাকা পাঠিয়েছিল। ওটা তারই রসিদ।

পুলিশ গেল ইউজিনে। ঠিকানা খুঁজে তারা সেখানে রয়-এর বাবা পন ডি' অট্রিমন্ট-এর দেখা পেল। তাঁর তিন ছেলে—রয়, রে এবং হুগ্। রয় আর রে যমজ। রয় কাঠুরের কাজ করে। সে ন্যাটা। তবে তিন ভাইই বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। কবে থেকে নিরুদ্দেশ তা খোঁজ করে দেখা গেল যেদিন সুড়ঙ্গপথে ট্রেন আটক করে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছিল, ঠিক তার আগের দিন থেকে পল তাঁর তিন ছেলের খোঁজ পাচ্ছেন না।

পুলিশের এর পর প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল তিন ভাইকে খুঁজে বার করতে। বিভিন্ন জায়গা থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ছবি : মদন সরকার

মনের কথা

দেবাংশু চক্রবর্তী

ইচ্ছে তো হয় দুচোখ ভরে আকাশটাকে দেখি
ইচ্ছে করে দেখতে আমার নানান রঙের পাখি,
ইচ্ছে করে দাঁড়াই গিয়ে ফুলের বাগানটাতে
সময় কাটাই মৌমাছি আর প্রজাপতির সাথে।
ইচ্ছে করে সবুজ গাছের ছায়ায় বসি গিয়ে
আনন্দে মন ভরিয়ে তুলি হাওয়ার খুশী নিয়ে,
কিন্তু কোথায় পাবো সেসব এই শহরে থেকে
সারি সারি লম্বা বাড়ি দেয় যে আকাশ ঢেকে।

কেমন করে আসবে পাখি নেই তো গাছের ছায়া
রাস্তা ভরা গাড়িগুলো ছড়ায় শুধুই ধোঁয়া,
আসত উড়ে প্রজাপতি থাকলে ফুলের বন
কোথায় বাগান শুধুই বাড়ি গাড়ি মানুষ জন।
ঘুম ভাঙে রোজ সকালবেলা কলের বাঁশি শুনে
সারাটা দিন গাড়ির আওয়াজ তালা ধরায় কানে,
কেউ জানে না এই শহরে কেমন করে থাকি
মনের কথা তাইতো আমি ছড়ায় লিখে রাখি।

ছবি : সুফি

মিস্ট্রি

অপূর্ব দত্ত

টুটু বলল, 'না রে বিল্টু, আমি স্পষ্ট শুনেছি সেজোমামা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলছে ইম্পসিব্‌ল ইম্পসিব্‌ল। এ হতে পারে না। তুমি বুঝতে পারছ না। পরের ছেলে দু'দিনের জন্যে এসেছে। যদি কিছু হয়ে যায় কী কৈফিয়ৎ দেবে?'

বিল্টু বলল, 'কাকে বলছিল রে?'

'সেজো মামীমাকে।'

'কি নিয়ে রে? সেজোকাকুর কি হয়েছে? কোনও বিপদ?'

'তা জানি না। তবে কালকেও শুনেছিলাম সেজোমামা সেজো মামীমাকে বলছিল ঐ চিঠির কথা। কালকের ডাকে কি একটা যেন চিঠি এসেছে। খুব ভয়ের। তাতে নাকি এই বাড়ির অনেকের নাম লেখা আছে।'

'কার কার নাম আছে রে? সেজোকাকারও?'

'দূর, বোকা, সেজোমামার নাম তো থাকবেই। সেজোমামার নামেই তো চিঠিটা এসেছে। অবশ্য শ্যামল বলে লেখেনি। সেজোমামার ডাক নাম যে বুবাই সেটা পত্রলেখক জানে।'

বিল্টু হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ রে টুটু, অত বড় লোকের নাম বুবাই হয় নাকিরে?'

টুটু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'তোর আই কিউ কিন্তু খুব কম। তোর যখন ষাট বছর বয়স হবে তখন কি তোর নাম বিল্টু থেকে বঙ্কুবিহারী করে দিবি?'

'হ্যাঁ রে টুটু, ওতে তোর নামও আছে?'

'আরে, সেইজন্যেই তো সেজোমামার এত চিন্তা। বাবা তো আমাকে এবার পুজোয় আসতে দিতেই চায়নি। সেজোমামা মাকে খুব করে ধরল। তাই এলাম।'

'তা তুই চিঠিটা পড়েছিস।'

টুটু কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমনি সময় তার সেজোমামার গলা শোনা গেল। 'বড়দা, বড়দা....'

বিল্টু বলল, 'ঐ দ্যাখ সেজোকাকু বাবাকে ডাকছে। বোধহয় নতুন কোনও ক্লু পাওয়া গেছে। চ' আমরা লুকিয়ে শুনি।'

'বড়দা, তুমি বুঝতে পারছ না, রীতিমতো ভয়াবহ চিঠি। নিশ্চয় কোনও জাত ক্রিমিনালের কাজ। তুমি এখনই পুলিশে খবর দাও। দেখছ না চিঠিটায় আমাদের হাউস ফিজিসিয়ান ডঃ ভারমার নামও লেখা আছে।'

'তা কি লিখেছে চিঠিতে?'

'সেজোমামা বললে, আরে সেটা বুঝতে পারলে তো হয়েই যেত। কেসটা মিস্টিরিয়াস। তবে আমি সিওর, ক্রিমিনাল অনেক ভাষা জানে। সেই চর্যাপদ ব্রজবুলি থেকে শুরু করে সংস্কৃত, ল্যাটিন এমনকি হিব্রু পর্যন্ত।'

'দেখি চিঠিটা।'

আড়াল থেকে টুটু আর বিল্টু উঁকি মারে। টুটু বিল্টুকে ঠ্যালা দিয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'দেখছিস, বড়মামার মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে।'

চিঠিটা শেষ করে বড়মামা বললেন, 'ঠিক আছে। ওখিরাকে ডাক। ওকে বল শকুরামের রিকশায় করে গিয়ে ও. সি. মিস্টার লস্করকে খবর দিয়ে আসুক।'

সেজোমামা অধৈর্য হন। 'দাদা, তুমি চিঠিটা কিচ্ছু পড়নি। বলছিলাম অপরাধী খুব সাধারণ বুদ্ধির লোক নয়। হাইলি ইনটেলেকচুয়াল। এর মধ্যে তো ওখিরা এবং মিস্টার লস্করের নামও আছে। ঠিক মতো না জানার জন্য লস্করকে লস্কুর করে দিয়েছে। সব থেকে আশ্চর্যের কথা শকুরাম যে রাতে আমাদের বাড়ি থাকে এবং রিকশা চালায় সেটা কি করে জানল?'

'তা হলে এক কাজ কর। থানায় ফোন কর আমার নাম করে। আর আমি যাচ্ছি আমাদের কলেজের বাংলার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের কাছে। উনি একজন লিঙ্গুইস্ট।'

সেজোমামা বাধা দেন, 'আমি বলি কি দাদা একবার জামাইবাবুকে খবর দাও। উনি তো ইনটেলিজেনসের বড়কর্তা। নিশ্চয় রহস্য সলভ করতে পারবেন।'

'তাই তো!' বড়মামার মনে পড়ে যায়। বলেন, 'আজকেই তো বরেণের টেলিগ্রাম পেয়েছি, বিকেলেই আসছে টুটুকে নিতে। ওদের সাতাশ তারিখে স্কুল খুলবে। তুই বরং টুটুকে একটু চোখে চোখে রাখিস। আমাকে স্টেশনে যেতে হবে ওকে রিসিভ করতে।'

দুপুরে খাওয়ার পর টুটু এসে বিল্টুকে বলল, 'শীগগির বাগানে চ'। কথা আছে। আমি সেজোমামার টেবিল থেকে চিঠিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা কপি করেছি।'

বিল্টু উৎসাহভরে জিগ্যেস করে, 'কি লেখা আছে রে?'

'কিচ্ছু বুঝবি না। শুধু নামগুলোই বুঝতে পারবি। ওর মধ্যে আমার, ভারমার, ওখিরা, লস্কুর এবং শুকুরামের কথা লেখা আছে। সেজোমামাকে এ্যাড্রেস করে লেখা। লাস্টে লেখা বাবু।

বাগানে গিয়ে টুটু চিঠিটা দেখাল। সাধারণ সাদা কাগজে লেখা। পরিষ্কার হাতের লেখা। কোনও তারিখ বা জায়গার নাম নেই। চিঠিটায় লেখা আছে—

> 'বুবাই, ম'জার মা তো ওনিসাবাল। ভারমা আরাম তোয়নল ভার। রীশরদিদির মা তো ওখিরায়াদির বখকেল। কি উদপরা তাবেই। লয়াঝি বুয়ষবির মা। জমি জর দে মা। তোর পর বাইয়া মিআ। বেলিখু লস্কুর। ও খেরি তাশ তাসা মীগা। আবসি আয়া। ইলকে টুটু মিআ ন দি। ঐড়া ছাতা, না ওখিরা? লাখো রপ্তদন দিও বে। কি থানেশ। স্টেতময়ম সমিতু। বই যায়। সাবার দে মা। তোর বাবির মীগা আমি আছ। আলে শকুরাম তো রিকশ' আই, বাবু।'

বিকেলে টুটুর বাবা আসতেই সেজোমামার মুখে হাসি খেলে গেল। তিনি চিঠির ব্যাপারটা সবিস্তারে তাঁকে জানালেন। সব শুনে টুটুর বাবা বললেন, 'দেখি কি চিঠি।' সেজোমামা চিঠিটা এনে তাঁর হাতে দিতে টুটুর বাবা সেটা খুব তাড়াতাড়ি পড়ে ফেরৎ দিলেন।

সেজোমামা বললেন, 'ইজ ইট নট মিস্টিরিয়াস, জামাইবাবু?'

টুটুর বাবা কিছু বলার আগেই টুটু এল লাফাতে লাফাতে। সেজোমামা, সেজোমামা, প্রবলেম সলভড। প্রমিস কর আমাদের দুজনকে ক্রিকেট ব্যাট কিনে দেবে।'

সেজোমামা বলেন, 'আগে বল কি হয়েছে।'

'এই দ্যাখো চিঠির মিস্ট্রি সলভড।'

টুটু একটা কাগজ দিল। তাতে লেখা আছে—

> বুবাই, আশা করি তোমরা কুশলে আছ। আমি আগামী রবিবার তোমাদের বাসায় যাইব। তুমি সময়মত স্টেশনে থাকিবে। ওদিন দপ্তর খোলা রাখিও না, তাছাড়া ঐ দিন আমি টুটুকে লইয়া আসিব। আগামী সাতাশ তারিখে ওর স্কুল খুলিবে। আমি যাইবার পর তোমাদের জমিজমার বিষয় বুঝিয়া লইবে। তারাপদ উকিলকে খবর দিয়া রাখিও। তোমার দিদির শরীর ভাল নয়। তোমরা আমার ভালবাসা নিও।
>
> তোমার জামাইবাবু

'এটা আবার কোথায় পেলি?' সেজোমামা জিজ্ঞেস করলেন

'তুমি তোমার মিস্টিরিয়াস চিঠিটা তলার দিক থেকে ওপর অবধি পড়। আর প্রয়োজনমতো দাঁড়ি কমা চেঞ্জ করে দাও তা হলেই সলভড চিঠিটা পেয়ে যাবে।' টুটু উত্তর দিল।

সেজোমামা ঐ ভাবে চিঠিটা জোরে জোরে পড়তেই সবাই হো হো করে হেসে উঠল। আর সেজোমামা মুখ গম্ভীর করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাটতে লাগল। জামাইবাবু তাকে আচ্ছা বেকুব বানিয়েছেন।

টুটুর বাবা ঠাট্টার সুরে বললেন, 'বুবাই, কাল থেকে চাকরিতে ইস্তফা দাও। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা যা পাবে তার থেকে এদের দুটো ক্রিকেট ব্যাট কিনে দিও। আর শাস্তি হিসেবে আমাকে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দাও।'

টুটু ও বিল্টু সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'সেজোমামা হেরে, সেজোকাকু দুয়ো।'

কবিতার কেরামতি

শৈবাল চক্রবর্তী

ওভারকোটের ওপর কাশ্মীরি শাল, হন্তদন্ত হয়ে এসে সামন্তমশাই বলেন, 'কই চলো, সাহিত্যসভায় যাবে তো সবাই।'

তাঁর হাতে সেই সাবেক ছাতা, পরনে মান্ধাতার আমলের ওভারকোট। কবে থেকে তাঁর এই এক বেশভূষা নিজেরাই ভুলে গেছি। বয়সে তিনি আমাদের বাবা-কাকাদের সমান কিন্তু আমাদের সঙ্গে মেশেন যেন আমাদের সমবয়সী একজন।

অবাক হয়ে বলি, 'সাহিত্যসভা? অবাক করলেন দেখছি। আজ তো মাছ ধরতে যাওয়ার কথা। বেড়াচাঁপা।'

পুটু বলে, 'এই তো গত সপ্তাহে কথা হলো। এরই মধ্যে ভুলে গেলেন!'

উনি দাড়ি চুলকে বলেন, 'এ্যাঁ তাই নাকি! আমার যেন মাথায় ঘুরছে আজ কবিতা পড়া হবে। রাত জেগে সনেট লিখলাম তাই এক ডজন।' ওভারকোটের পকেট থেকে একটা মোটা খাতা বার করে ফেলেন, 'দারুণ সব কবিতা, যেমন ভাব, তেমনি ছন্দ।'

বাধা দিয়ে চাঁদুদা বলে, 'আপনি তো আচ্ছা লোক! এই কাঠফাটা রোদে কেউ সাহিত্যসভা করে! সে হতে পারে দু এক পশলা বৃষ্টি পড়লে, ধরুন এই শ্রাবণ মাসের বাইশ তারিখ।'

উনি আমতা আমতা করেন, 'ও তাই বুঝি! সনেটের জায়গায় সরপুঁটি, কলমের বদলে বঁড়শি। তা বেশ চলো। কোথায় যেতে হবে?'

'ওই তো বললাম, বেড়াচাঁপা,' চাঁদুদা জবাব দেয়। 'নকুড় বোসের বাগানবাড়ির নাম শুনেছেন তো? সেখানেই।'

উনি বলেন বটে 'বেশ বেশ', কিন্তু ওঁর মুখ দেখে বুঝতে পারি মনে মনে উনি গুমরে মরছেন। কত সাধ করে কবিতা লিখে এনেছিলেন সবাইকে শোনাবেন বলে, তা সেসব তো শিকেয় তুলে রাখতে হচ্ছে। ছিপও আনেননি সঙ্গে যে আমাদের সঙ্গে বসে যাবেন।

যেতে যেতে পুটু শুধোয়, 'আবার শাল চড়িয়েছেন কেন কোটের ওপর?'

উনি লজ্জা পেয়ে হাসেন, 'ওই সাহিত্যসভার কথা মনে করেই। ওভারকোট তো আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী—' ফের ফস করে খাতাটা টেনে বার করেন। 'শুনবে, শুনবে শিবু আমার সনেট একটা?'

আমি তাঁর হাত ধরে টানি, 'এই কি কবিতা পড়ার সময়?

এখুনি বাস এসে পড়বে। জানেন তো আজ অবিনজেঠু কি বলেছেন! সবচেয়ে বড় মাছটা যে ধরতে পারবে তাকে উনি তাঁর সেই কাপটা দিয়ে দেবেন। কোন কাপটা বলুন দিকি?'

'ওই যেটা উনি সাঁতরে গঙ্গা পারাপার করে পেয়েছিলেন উনিশশো তিরিশে—'

'ঠিক বলেছেন,' আমি বলি। 'তবেই বুঝে দেখুন কি মরণ-বাঁচন লড়াই।'

হঠাৎ চাঁদুদা চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাস, বাস এসে গেছে।'

'চলুন, চলুন' হুড়মুড়িয়ে বাসে উঠে পড়ি চারজনে।

ঘণ্টা দুই পরে বারাসতের মোড়ে নেমে একটা সাইকেল ভ্যানে সওয়ার হওয়া যায়। মিনিট পনেরো পরে একটা মান্ধাতার আমলের দোতলাবাড়ির সামনে আসতে চাঁদুদা বলে, 'এই যে এখানেই নামতে হবে।'

বাড়ির চারদিকে মস্ত বাগান। তাতে যেমন বাহারী ফুল গাছ আছে অনেক, তেমনি আছে অজস্র তাল, নারকেল আর সুপুরি গাছ।

গেট পেরিয়ে বাগানে ঢুকতে ঢুকতে বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে চাঁদুদা বলে, 'এই হলো বসুভিলা। নকুড় বোসদের তিন পুরুষের বাড়ি। বাগানের মাঝখানে ওঁদের সেই বিখ্যাত পুকুর।'

চাঁদুদাই এ অভিযানের নেতা। আমাদের খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইয়েদের মধ্যে ও বছর দুয়েকের বড়, কিন্তু সর্দারিভাবটা এমন দেখায় যেন ও আমাদের জ্যাঠামশাই।

পুকুরের দিকে যেতে যেতে সামন্তমশাই বলেন, 'ও শিবু, যাঁদের পুকুর মাছ ধরার জন্যে তাঁদের অনুমতি নেওয়া হয়েছে তো? নকুড় বোসমশাই খুব বদরাগী লোক বলে শুনেছি।'

মাথা নেড়ে বলি, 'সে সব ব্যবস্থা চাঁদুদা করেছে। ওর এক বন্ধুর সঙ্গে বোসকর্তার দারুণ দহরম-মহরম। সে-ই এসে বুড়ো নকুড় বোসকে...কি চাঁদুদা ঠিক কিনা?'

ভারিক্কি চালে মাথা নেড়ে চাঁদুদা জবাব দেয়, 'হ্যাঁ নিরাপদ সব ব্যবস্থা করে গেছে। তা নিয়ে তোদের মাথা ঘামাতে হবে না। তোরা এখন এক একটা জায়গা দেখে বসে যা দিকি।'

পুকুরটার চারপাশে ঘন গাছপালা। পাড়টা বেশ উঁচু। রাতে চার দেওয়া হয়েছিল চাঁদুদার বন্ধু নিরাপদর মারফৎ। তাই মাছ দেখি জলে বুড়বুড়ি কাটছে। আমরা তিন ভাই ছিপ নিয়ে তিন দিকে বসে যাই। সামন্তমশাই ক্রমাগত উসখুস করছেন। শুধু খাতায় যে কবিতা ঠাসা তাই নয়, হয়তো মাথাতেও কবিতা এখনো গজগজ করছে। গুটিগুটি আমার কাছে এসে উনি বলেন, 'শুনবে নাকি শিবু সনেট একটা? কিংবা লিমেরিক একখান।'

বিরক্তি চেপে বলি, 'কি যে বলেন, চারে মাছ ঘুরছে এই কি সনেট শোনার সময়!'

সামন্তমশাই এগিয়ে যান পুটুর কাছে। হাতে সেই খাতা। কাতরভাবে বলেন, 'পুটু তোমায় শোনাই একটা—'

'কবিতা শুনব তাই না!' পুটু ছোট বলে বিরক্তি চাপতে পারে না, 'আর মাছ টোপ খেয়ে হাওয়া হয়ে যাক আর কি! আজ যে সবচেয়ে বড় মাছটা ধরতে পারবে তাকে অবিনজেঠু কি দেবে বলেছেন জানেন কি?'

'জানি।' সামন্তমশাই ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলেন একটা, 'কিন্তু মাছ ধরবে বলে কবিতা শুনবে না এ কেমন কথা।' উনি গজগজ করেন আর কবিতা আওড়ান।

ভাল বিপদ হলো তো ওঁকে সঙ্গে এনে! হরদম ঘুরছেন আর কবিতা শোনাবেন বলে বায়না ধরছেন এর তার কাছে। অমন ছটফট করলে আমরাই বা মাছ ধরায় মন দিই কি করে।

'চাঁদু শুনছ তো?' আমাদের কাছে সুবিধে করতে না পেরে এবার গেছেন দলনেতার কাছে।

'উঁহু।' চাঁদুদা মাথা নাড়ে, 'আগে মাছ উঠুক তারপর যদি সময় থাকে তবে।'

কিন্তু ওঁর ভাব এসে গেছে। খচখচ করে লিখেও ফেলছেন মাঝে মাঝে। ওঁর মুখ দেখে মায়া হয়। আমরা না হয় মাছ ধরার নেশায় মেতে আছি কিন্তু ওঁর যে সময় কাটতে চায় না।

ফের আমার পাশে এসে বসেন, 'শিবু—'

ঠিক তখন আমার ফাতনাটা ডুবে যায়। আমি ছিপ ধরে জোরে টান মারি। ওদিক থেকে চাঁদুদা চেঁচায়, 'হ্যাঁচকা টান মারিস না শিবু। মনে হচ্ছে, বড় মাছ।'

মাছটা তখন পুকুরের এপার থেকে ওপার করছে। মাঝে মাঝে লেজের ঝাপটা মারছে জলের ওপর। পুটু সটান দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'ইস্ কত বড় মাছ রে শিবুদা। অবিনজেঠুর কাপটা নির্ঘাৎ তুই পাবি।' এমনি সময় বসুভিলার দোতলা থেকে কাঠচেরা গলা শোনা যায়, 'পুকুরপাড়ে কারা রে? লুকিয়ে মাছ ধরছিস বুঝি? দাঁড়া যাচ্ছি লাঠি নিয়ে।'

'নকুড় বোস!' পুটু ধপ করে বসে পড়ে। সামন্তমশাইয়ের হাত থেকে কবিতার খাতা মাটিতে পড়ে যায়। সেটা তুলে নিয়ে ভীতু ভীতু গলায় তিনি বলেন, 'ক-কি হবে শিবু?' চাঁদুদারও চোখ মুখ বসে গেছে। বলে, 'চ পালাই।'

ঠিক তখনই দেখা দেন নকুড় বোস। ওহ্ একটা দৃশ্য বটে। তালগাছের মতো ঢ্যাঙা আর কঙ্কির মতো রোগা। মাথার চুল কদমছাঁট, গায়ে ফতুয়া, পরনে মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি। খাঁড়ার মতো নাক আর রোমশ ভুরু জোড়ার নিচে চোখ দুটো জ্বলছে ধকধক করে। বয়স হবে পঁয়ষট্টি কিন্তু ছুটছেন যেন মোহনবাগানের স্ট্রাইকার—সামনে ফাঁকা গোল দেখেছে।

হাতের তেল চুকচুকে লাঠিটা দুবার শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিয়ে আমাদের তিন ভাইকে দেখেন। 'হুম্ একেবারে তোরোস্পর্শ।

দাঁড়া আসি।' হুমহাম করে দুটো বৈঠক দিয়ে সিধে হয়ে হাঁকেন, 'এবার আমি রেডি।'

আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আর উনি যেখানে এসে থামেন তার মাঝে একটা পগার। সামন্তমশাই বেগতিক দেখে ওই পগারের কাছেই একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছেন।

নকুড় বোস পগারটা পার হবার জন্যে একটা লংজাম্প দেবেন—চাঁদুদা টোঁক গিলে বলে, 'ইয়ে নিরাপদ কিছু বলেনি আপনাকে। নিরাপদ মিত্র আমার সহপাঠী।'

'নিরাপদ নামে কস্মিনকালে কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ে না হে।' খ্যানখেনে গলা তাঁর, 'তবে তোমাদের যে আজ বিষম বিপদ তা বেশ বুঝতে পারছি। এই কে আছিস বাগানের গেট সব বন্ধ করে দে। একটা মাছিও যেন পালাতে না পারে। সব কটাকে পিটিয়ে আজ তক্তা বানাবো।'

ভয়ে আমরা সব থরহরি কম্পমান। তিনটে যমদূতের মতো চাকর দুদ্দাড়ে তিনদিকে ছুটে যায়। এদিকে নকুড় বোস পগার পার হতেই সামন্তমশাই পড়লেন তাঁর সামনে।

'ও আপনি বুঝি পালের গোদা?' নকুড় বোস চোখ পাকান, 'তা আপনার ছিপ কই।'

'নেই,' উনি মাথা নাড়েন। এক হাতে তুলে ধরেন ছাতা অন্য হাতটায় ধরা সেই কবিতার খাতা।

এ দিকের দৃশ্য অন্যরকম। মাছটা সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে গেলে বাঁচতুম। কিন্তু সে সমানে গোটা পুকুর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চাঁদুদা আর পুটু পেছন থেকে আমার কোমর জড়িয়ে ধরেছে যাতে সুতোর টানে আমি জলে গিয়ে না পড়ি।

ওদিকে সামন্তমশাইকে নকুড় বোস প্রদক্ষিণ করছেন, অনেকটা দাগী আসামীকে পুলিশ যে ভাবে দেখে সে রকম। পেছনে ঘুরতেই তাঁর চোখ দুটি কুটিল হয়ে ওঠে। 'ও কি? ওটা কি?' আঙুল তোলেন নকুড় বোসমশাই বেয়নেট উঁচিয়ে ধরার ভঙ্গিতে।

'আজ্ঞে খাতা।'

'খাতা! কিসের খাতা?'

'আজ্ঞে ক-কবিতা।'

'কবিতা! আপনি কবিতা লেখেন।' সামন্তমশাইয়ের সামনে এসে তাঁর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেন নকুড় বোস।

'একটু আধটু।' সাহসে ভর করে সামন্তমশাই জবাব দেন, 'শুনবেন আপনি।'

'আলবৎ শুনব। না শুনে আপনাকে ছেড়ে দেব ভেবেছেন।' হাতের লাঠি আগেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নকুড় বোস, এবার দুহাতে সামন্তমশাইয়ের হাত দুটি ধরে বিগলিত ভঙ্গিতে বলেন, 'মশাই জলজ্যান্ত কবি আমি এই প্রথম দেখলুম। কবিতা শোনার জন্যে কি জানেন তো আমি পাগল একেবারে।' ফোকলা দাঁতে হাসেন নকুড়, 'আমার নাতি আমায় খুব পদ্য শোনায়। তা সে গরমের ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে পুরী গেছে বলে আমার দিন যেন কাটতে চায় না....'

তিনি তেঁতুল গাছে পিঠ দিয়ে লম্বা হন আর সামন্তমশাই তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কবিতা পড়ে যান। প্রথম সনেটটাও শেষ হয়েছে আর আমিও কাদায় পা হড়কে এক মোক্ষম টানে দশ সেরী কাতলাটাকে ডাঙায় তুলে বলেছি, 'বাপস!'

দই, চিঁড়ে, কলা আর বনগাঁর বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা দিয়ে জলযোগ করিয়ে বেড়াচাঁপার মোড়ে এসে আমাদের বাসে তুলে দিয়ে যান নকুড় বোস। মাছটা তাঁর চাকর বংশী মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসে। সামন্তমশাই আপত্তি করলে তিনি মাথা নেড়ে বলে ওঠেন, 'থামুন তো আপনি। ওই দুধের বাছারা অত ভারী বোঝা বইতে পারে কখনও। হ্যাঁ, কি বলেছি মনে আছে?'

সামন্তমশাই ঘাড় নাড়েন।

'কি বলুন দিকি। কবিরা ভারী ভুলো হয়।' তিনি এক গাল হাসেন।

শুনে তো আমরা তাজ্জব। গরম কমলে আমাদের যে সাহিত্যসভা করার কথা সেটা এই বসুভিলার বাগানবাড়িতে করতে হবে। আর সেবার এমনি জলখাবার খেয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না, দুপুরের খাওয়া সারতে হবে এখানে। আর সামন্তমশাইকে তাঁর পুরো খাতায় কবিতা লিখে এনে শোনাতে হবে তাঁকে। ছেলেরা যদি মাছ ধরে, ফল-পাকুড় পেড়ে সময় কাটাতে চায় কাটাক, কিন্তু সামন্তমশাইয়ের কাজ হবে শুধু কবিতা পড়ে যাওয়া।

'কি মনে থাকবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বাড়ি ফিরে এসে সেদিন অবিনজেঠুর দেওয়া কাপটা আমরা সামন্তমশাইয়ের হাতেই দিয়েছিলাম, সেটা বোধহয় তোমরা অনুমান করতে পেরেছ এতক্ষণে।

ছবিঃ ধ্রুব রায়

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

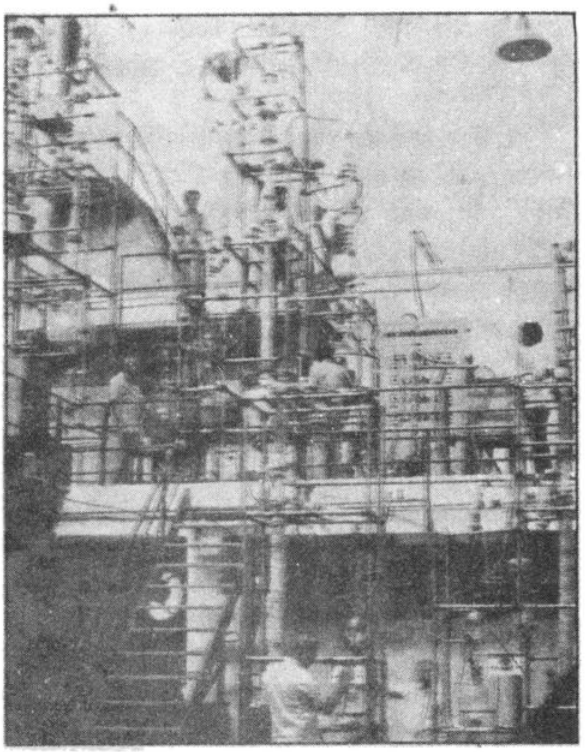

সস্তায় ওষুধ

ছোটবেলায় দেখেছি টাইফয়েড, যক্ষ্মা এসব অসুখের নাম শুনলেই লোক আঁতকে উঠত। রোগীও জানত অনেক টাকাপয়সা খরচ করলে তবে সে হয়তো বাঁচবে। আমি যেখানে থাকতাম সেই মফস্বল শহরের ওষুধের দোকানেও টাইফয়েড, যক্ষ্মা রোগের ওষুধ পাওয়া যেত না। আনাতে হতো বড় শহর বা কলকাতা থেকে। তাছাড়া সেই সময় অধিকাংশ ওষুধগুলো আসত বিদেশ থেকে, তাই দামও ছিল অনেক বেশি। এখন ভারতবর্ষের গ্রাম-গঞ্জের ওষুধের দোকানগুলিতে শুধু যক্ষ্মা টাইফয়েড নয়, বহু জীবনদায়ী ওষুধই অনেক ন্যায্য দামে পাওয়া যায়। এটা সম্ভব হয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও সাধনা দিয়ে। ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা ওষুধপত্রের ব্যাপারে নানান গবেষণা করে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হায়দ্রাবাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল টেকনোলজী, সংক্ষেপে IICT । বর্তমান ডিরেক্টর ডঃ এ. ভি. রামা রাওয়ের নেতৃত্বে গবেষণা করে সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ এক নতুন পদ্ধতিতে ভিটামিন বি$_6$ (B_6) তৈরি করতে পেরেছেন। বিভিন্ন ওষুধ তৈরিতে এই বি$_6$ ব্যবহার করা হয়। দুবছর আগে পর্যন্ত বি$_6$ কিলো প্রতি ১০০০ মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৮০০০ টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে আনাতে হতো। এখন ভারতবর্ষে এটি পাওয়া যাচ্ছে কিলো প্রতি মাত্র ৮০ মার্কিন ডলার বা ২৪০০ টাকায়। সস্তায় বি$_6$ তৈরির এই পদ্ধতি ব্যবহার করে যে কেউ ভিটামিনটি উৎপাদন করতে পারে বৈধ্য অনুমতি নিয়ে। ইতিমধ্যে কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ী বি$_6$ বিদেশে রপ্তানীও আরম্ভ করেছেন। এইভাবেই লক্ষ্ণৌর সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ল্যাবরেটারী, পুনের ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটারী, IDPL, HAL ইত্যাদি সংস্থা গত দুবছরে অনেক নতুন ওষুধ ও সস্তায় ওষুধ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। ভারতবর্ষে অন্যান্য জিনিসের দাম বাড়লেও তাই জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়ছে না। মানুষকে সুস্বাস্থ্য ও জীবন দিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেই যাচ্ছেন। এখন আর রোগের নামে কেউ আঁতকে ওঠে না।

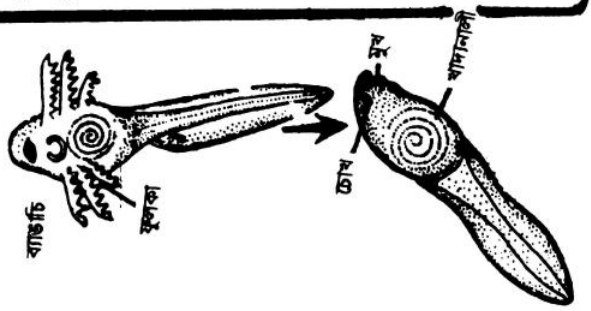

লেজ থেকে পা!

গল্পটা তোমরা নিশ্চয় জান। এক মাছি বিধাতার কাছে লেজ চেয়েছিল। বিধাতা তাকে বলেছিলেন পছন্দমতো জন্তুর কাছে গিয়ে লেজ চেয়ে নিতে। মাছি তখন বিভিন্ন লেজওয়ালা প্রাণীকে জ্বালাতন করে। কেউ লেজ দিতে রাজী হয় না। অবশেষে মাছি যখন গরুর কাছে গিয়ে ভনভন করে তাকে লেজের জন্য জ্বালাতন করতে থাকে তখন লেজের এক ঝাপটায় গরু মাছিকে মেরে ফেলে। বিধাতাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এই লেজ নিয়েই এক খোশ খবর দিয়েছেন উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন বিজ্ঞানী। বিদেশে ব্যাঙের পা একটি উপাদেয় খাদ্য। তাই এদেশ থেকে ব্যাঙ ধরে চালান দেওয়া হয় বিদেশে। এদিকে দেশে মশা-মাছির উপদ্রব খুব বেড়ে গেছে। আমাদেরও নাজেহাল অবস্থা। বিজ্ঞানী এস. কে. দত্ত, পি. মহাপাত্র ও পি. মহান্তী ব্যাঙাচির লেজকে ভিটামিন-এ দিয়ে ব্যাঙের পায়ে পরিণত করতে পেরেছেন। আবার লেজকাটা ব্যাঙাচিকে ভিটামিন-এ দিয়ে ব্যাঙে পরিণত হতে দিলে তারও সাত-আটটি পা হবে। খুব মজার ব্যাপার, তাই না! এক ব্যাঙের আট পা, তার মানে অনেক মাংস, দেদার বিদেশী মুদ্রা, আবার মশা-মাছির হাত থেকেও বাঁচোয়া।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা

ভালো আছো তো সকলে?

শীতের বুড়ি কিরকম চুপি চুপি এসে হানা দিয়েছে দেখেছো? চুপি চুপি বললে অবশ্য ভুল বলা হবে। দুর্গা পুজোর সময়ই রাতের দিকে দিব্যি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব ছিল। তা এখন তো শীতের ভরা মরশুম। মাঠে মাঠে ক্রিকেট খেলার ধুম। বাজার ভরা ফুলকপি, কমলালেবু, নতুন গুড় আরো কতো কি! বাগান আলো করে রেখেছে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা আরো কতো মরশুমী ফুল। উত্তর দিক থেকে হিম মেখে হাওয়া এসে আমাদের কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এই সময়টা ভীষণ ভালো। খেয়ে আনন্দ, বেড়িয়ে আনন্দ, খেলে আনন্দ। কিছুদিন আগেও যে রোদ গা পুড়িয়ে দিতো সেই রোদ এখন মিঠে। শীতের দুপুরে কমলালেবু খেতে খেতে ক্রিকেট খেলা দেখার মজাই যে আলাদা। বছরের বারোটা মাসের মধ্যে শীতের কটা মাসই সব থেকে ভালো তাই না?

তা তোমাদের খবর বলো। দুর্গাপুজো, কালীপুজোর পর এবার তো সরস্বতী-আরাধনার জন্যে তোমরা তৈরি হচ্ছো। এই শীতের রাত্তিরে তোমরা যদি কোনোদিন ছাদে উঠে আকাশের দিকে তাকাও তাহলে দেখতে পাবে তারায় ভরা ঝকঝকে আকাশ। পৌষ মাসের আকাশের তারাদের তো আগেই চিনিয়ে দিয়েছি। ভালো করে দেখে চেষ্টা করো তাদের চিনে নিতে। এই আকাশের দিকে তাকালেই তোমাদের চোখে পড়বে ছায়াপথ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে ছায়াপথ চলে গেছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। পুব আকাশে মিথুন রাশির পাশে নতুন একটি নক্ষত্র দেখা যায়। এর নাম 'প্রশ্বন'। এই প্রশ্বন আর পুষ্যা নক্ষত্র থেকেই সম্ভবত এই মাসের নাম পৌষ। এখন রাত্তির দিনের চেয়ে অনেক ছোট। তবে ২১ ডিসেম্বর থেকে সূর্য মকরক্রান্তি ছুঁয়ে আবার উত্তর দিকে ঢলতে শুরু করে। ফলে রাত্তিরও ছোট হতে শুরু করে। এই মাসে কিন্তু দিনের চেয়ে রাত্তির বড়ই থেকে যায়। তাই ২৫ ডিসেম্বরকে আমরা বড়দিন বললেও সেই দিনটা রাত্তিরের চাইতে মোটেই বড় নয়। বেশ ছোট।

তোমরা কাগজে পড়েছো, টিভিতে ছবি দেখেছো—মহারাষ্ট্রে কত বড় ভূমিকম্প হয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষ সেই ভূমিকম্পে মারা গেছেন। বাড়ি, ঘরদোর ভেঙে মাটিতে মিশে গেছে। কেন এমন হয়? বিজ্ঞানীরা বলেন, মাটির নিচে শিলাস্তর যদি কোনো কারণে কেঁপে ওঠে তাহলে সেই কম্পন ছড়িয়ে পড়বে শিলাস্তরের চারদিকে। শিলাস্তরের এই কম্পনই ভূমিকম্প। ব্যাপারটা কিরকম জানো? ধরো তোমরা একটা পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছো। তোমাদের এক বন্ধু এক ঢিল ছুঁড়লো পুকুরের জলে। যে জায়গায় ঢিলটা পড়লো তার চারপাশে গোল হয়ে কম্পন সৃষ্টি হলো। খেয়াল করে দেখো সেই কম্পন কিভাবে পুকুরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের ব্যাপারটাও অনেকটা এইরকম। এ ছাড়া মাটির তলায় জমা গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে, ধস নামলে, পাহাড় গড়ার কাজ চললে, কিংবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলেও ভূমিকম্প হয়। ভূবিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন শতকরা ৬৮ ভাগ ভূমিকম্প প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে হয়। ২১ ভাগ হয় ভূমধ্যসাগর থেকে এশিয়া মাইনর, হিমালয় হয়ে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি জায়গায়। আর শতকরা ১১ ভাগ হয় পৃথিবীর অন্য সব জায়গায়। আসলে পৃথিবীর কোনো জায়গাই ভূমিকম্পের ভয় থেকে মুক্ত নয়। আমরা জানতে পারি না কিন্তু পৃথিবীতে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। গড়ে প্রতি ১৫ দিনে একটা বড় আকারের কম্পন হয়। সেগুলো প্রায় সবই ঘটে সমুদ্রে। তাই আমরা টের পাই না। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে কিন্তু এই সব কম্পন ধরা পড়ে।

এবার তোমাদের কয়েকজনের চিঠির উত্তর দিচ্ছি।

চন্দ্রিমা দাস (বয়স ৯, চতুর্থ শ্রেণী, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন, বীরভূম)

উত্তরঃ তোমার চিঠির উত্তর নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো। সত্যি বীথি খুব অন্যায় করেছে।

তিথি বসু (নবম শ্রেণী, শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, টেলকো, জামশেদপুর)

উত্তরঃ তোমার কবিতা দুটো ভালো হয়েছে। কিন্তু আরো ভাল চাই যে। আর একটু ছোট হলে ভালো হয়।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই!

ভালো থেকো সকলে? অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

পরীরানী

ও পরীরানী, ও পরীরানী
যাচ্ছ কোথায় তুমি ?
চাঁদের দেশে, মেঘের কোলে
যাচ্ছি ভেসে আমি।
নাচবো আমি মেঘের কোলে
তা ধিনতা ধুম্
খোকাখুকু চলে এসো
ফেলে চোখের ঘুম।

বিশ্বনাথ মিত্র,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
জয়নগর ইস্টিটিউশন,
২৪ পরগনা (দঃ)

অরিন্দম দাস, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, বারুইপুর হাই স্কুল।

আশা

ছোট আশা লুকিয়ে আছে
আমার মনের কোণে
যাব আমি অস্ট্রেলিয়া,
আমেরিকা পানে।
উতাল জলে জাহাজ চড়ে
তের নদীর পারে
ফিরব আমি তীরে তীরে
কিছু আবিষ্কারে।
পাওয়া যখন পূর্ণ হবে
আসব ফিরে ঘরে
বাংলা মায়ের সবুজ কোলে
এই মোহানার তীরে।

সলিল সরকার,
বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
পাড়ুয়া শশীভূষণ সাহা উচ্চতর বিদ্যালয়,
হুগলী

শান্তনু জাটী,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
বাইনান বয়েজ হাই স্কুল, হাওড়া

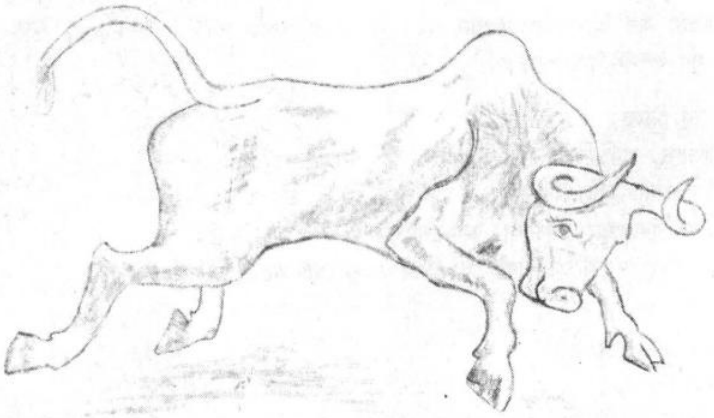

স্নিগ্ধা ঘোষ,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
শিবদাস সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুল,
বৈলাপাড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

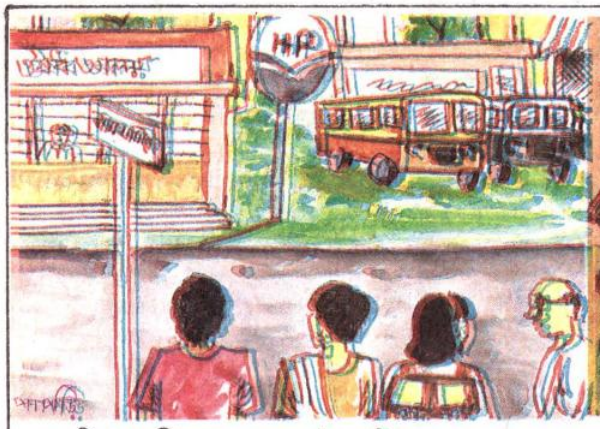

পাপড়ি চক্রবর্তী, বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী,
শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলী

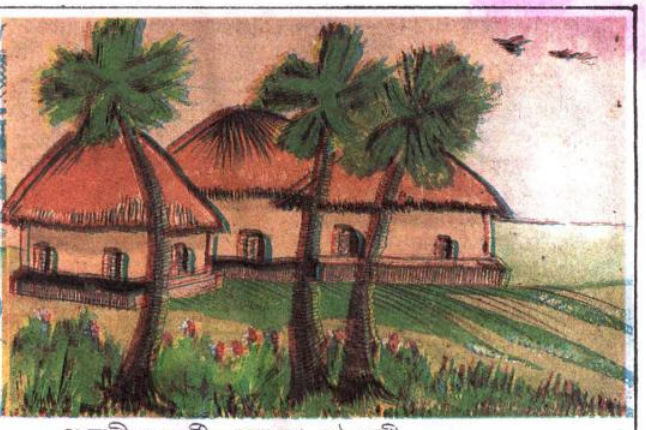

শুভশ্রী চক্রবর্তী, বয়স দশ, ষষ্ঠ শ্রেণী,
রাজেন্দ্র মিডল স্কুল, সিন্ধ্রী, বিহার

বিশ্বস্ত বন্ধু

জায়গাটির খানিকটা অংশ জুড়ে গাছটা বড় হয়ে উঠেছিল। সে ছিল আমাদের প্রতিদিনের এক বিশ্বস্ত সঙ্গী। এখানেই আমরা রোজ খেলা করি। গাছটা একদিকে যেমন ছিল ফুটবলের গোলপোস্ট তেমনি অপর দিকে ছিল ক্রিকেট বাউন্ডারির সীমানা। আবার কোনো কোনো দিন বিকেলে গাছটার তলায় বসে জমিয়ে গল্প করা হতো। গাছটা আমাদের যেন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন খেলতে এসে আমরা চমকে উঠলাম। দেখলাম আমাদের সেই বিশ্বস্ত সঙ্গী মাটিতে পড়ে আছে। তার ডাল থেকে পাতাগুলো কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের বন্ধু রতন ওই জমির মালিক নিমাইবাবুকে গাছ কেন কাটা হলো জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, নিজের চরকায় তেল দাওগে। পরে অবশ্য নিমাইবাবুর নতুন বাড়িটির জানলা, দরজা দেখে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলাম। মানুষ কি এই জন্যেই গাছ লাগায় যে পরে তার কাজে আসবে? শুকতারার বন্ধুরা তোমরাই বলো, গাছের প্রয়োজন কি এইটুকুই?

সম্বিত ব্যানার্জী,
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপিঠ, বহরমপুর

অর্পিতা সাহা, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
শান্তী বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল, গোয়ালপাড়া, অসম

পিয়ালী দাস, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
বেলঘরিয়া মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
কলিকাতা

চিরঞ্জীব গাঙ্গুলী,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
সেন্ট টমাস স্কুল, দুর্গাপুর

যুগ-যুগান্তের যাত্রী — ময়ূখ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কথার মধ্যে বাধা দিলাম, কিছু মনে করবেন না। আমায় সাহায্য করতে আপনি প্রাণবিপন্ন করে এগিয়ে এসেছিলেন; তাই প্রথমেই আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করে দিচ্ছে – আপনি আর আমি দুজনেই জানোয়ারটাকে দেখেছি.
কিন্তু এই ছেলে দুটি বলছে ওরা জন্তু-টন্তু কিছুই দেখতে পায় নি।
খুবই আশ্চর্য ব্যাপার বটে!
একটুও আশ্চর্য ব্যাপার নয়। লোকে ভয় পেলে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে পায় – তোমরা কালো চিতা দেখেছ! বুঝলে নিখিলদা'?
এখন চলো, ভদ্রলোকের ব্যাগটা নিয়ে আসি, ওটা ঐখানেই পড়ে আছে।
হ্যাঁ ভাই, চলো, ব্যাগটা নিয়ে আসি। তোমার মতো বাচ্চা ছেলে যদি ভয় না পায়, তাহলে আমার মতো জোয়ানের ভয় পাওয়া লজ্জার বিষয়।
তপেনের বন্ধু দেবু ছেলেটার সাহসও আছে, ক্ষমতাও আছে। ঐটুকু ছেলে যেভাবে ভদ্রলোককে ধরে ফেলল, তাতে বোঝা যায় ছেলেটা শরীরকে দারুণ খেলাতে পারে। ঠিকমতো তালিম পেলে ছোঁড়া একদিন দুর্ধর্ষ ক্যারাটেকা হতে পারে।

(চলবে)

ডাকটিকিটে কত কি

কবিতা রায়

ক্রিস্টমাস উৎসব

ডাক মারফত ক্রিস্টমাস অভিনন্দন পাঠানোর রেওয়াজ ডাকটিকিট প্রকাশের দু-তিন বছরের মধ্যেই শুরু হয়েছিল। প্রথম ক্রিস্টমাস কার্ড প্রবর্তনের মূলে যাঁর নাম শোনা যায়, তিনি হলেন, স্যার হেনরী কোলে। তবে ডাকটিকিটে ক্রিস্টমাস উৎসবের তাৎপর্য প্রতিফলিত হয় এর অনেক পরে। ক্রিস্টমাস ডাকটিকিটের জনপ্রিয়তা শুরু হয়েছিল তখন থেকেই যখন ১৮৯৮ সালে ক্রিস্টমাস উপলক্ষে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল কানাডার ডাকবিভাগ। ওই ডাকটিকিটকে অবশ্য অনেকে প্রথম ক্রিস্টমাস স্ট্যাম্প বলে মানতে রাজী নন। কারণ দুই সেন্ট দামের সেই ডাকটিকিটে শুধু 'XMAS 1898' কথাটি লেখা ছিল। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত আমেরিকার দুটি ক্রিস্টমাস ডাকটিকিটের একটি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ওই ডাকটিকিটের নকশায় ইটালির বিখ্যাত শিল্পী জর্জিয়োর আঁকা 'মেষপালকের উপাসনার' দৃশ্যবিশেষ মুদ্রিত ছিল। ১৫১০ সালে আঁকা আসল ছবিটি বর্তমানে ওয়াশিংটন আর্ট গ্যালারীর শোভাবর্ধন করছে। বলা যায়, সেই থেকে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের এই শুভ উৎসবকে কেন্দ্র করে নানান দেশের ডাকবিভাগ ডাকটিকিট প্রকাশ করে আসছে। ক্রিস্টমাস উৎসবের নানান আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবের প্রধান কেন্দ্র চার্চ, সান্তা ক্লজ, মোমবাতি, ক্রিস্টমাস ট্রী, খ্রীস্টজন্মের নানান বৃত্তান্ত, বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রভৃতি এই সব ডাকটিকিটে ধরা পড়েছে। এই বিশেষ টিকিটগুলি সংগ্রহ করলে ক্রিস্টমাস উৎসবের মেজাজটা অনেকাংশে উপলব্ধি করা যায়।

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টমাস ডাকটিকিটে একটি মজার জিনিস লক্ষ্য করার মতন। ওই ডাকটিকিটে সান্তা ক্লজকে সার্ফবোর্ড চড়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসতে দেখা যায়। সাধারণত সান্তা ক্লজকে আমরা উত্তরমেরুর তুষারাবৃত অঞ্চলের স্লেজগাড়ি চড়ে আসতে দেখি। কিন্তু এখানে নকশাটি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টমাস উৎসবের সঙ্গে সুপ্রযোজ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ভৌগোলিক কারণে ওই সময় অস্ট্রেলিয়ায় তখন গ্রীষ্ম।

ক্রিস্টমাস উৎসবের সময় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রথা আজও চলে আসছে। এই সব প্রথা অনেক ডাকটিকিটেও মুদ্রিত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত ফিনল্যান্ডের একটি ক্রিস্টমাস ডাকটিকিটে দেখা যায় দুটি বাচ্চা তাদের ঘোড়াকে খাবার দিচ্ছে। উৎসবের সময় একে অপরকে উপহার-সামগ্রী ও অভিনন্দন জানাবার রেওয়াজ আছে।

আইল অব ম্যান দ্বীপের অধিবাসীরা প্রতি ক্রিস্টমাস উৎসবের সময় একটি প্রথা বহুদিন থেকে পালন করে আসছে। প্রাচীনকালে দ্বীপবাসীদের নৌবাহিনী প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ত। তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, দ্বীপের এক জাতীয় গাইয়ে পাখির পালক সংগ্রহ করে সঙ্গে রাখতে পারলে দুর্ঘটনা এড়ান সম্ভব। তাই ক্রিস্টমাস উৎসবের প্রাক্কালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওই পালক সংগ্রহ করে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে দিয়ে আসত। এই প্রথার চিত্ররূপ মুদ্রিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত তাদের ক্রিস্টমাস ডাকটিকিটে।

এছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চার্চ-পেন্টিং, চার্চের স্টেইনড গ্লাসের অপরূপ দৃশ্যসমূহ, ক্রিস্টমাসের সময় প্রকৃতি কী রূপ পরিগ্রহ করে, কীভাবে মানুষ তার ঘরবাড়ি সাজায় ইত্যাদির দৃশ্যও বিভিন্ন দেশের ক্রিস্টমাস ডাকটিকিটে ফুটে উঠেছে। এইভাবে ক্রিস্টমাস ডাকটিকিট প্রকাশ আজ এই শুভ উৎসবের এক অবশ্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে।

অমাবস্যার রাতে

শিশিরকুমার মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশান্ত অন্ধকারের মাঝেই বাইরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাগানের সামান্য একটা অংশ জুড়ে যেন ঝড় বইছে। সেই ঝড়ের মাঝে একজন মানুষ প্রাণপণে নিজেকে সোজা করে রাখার চেষ্টা করছে। সে আবার আর্তনাদ করে উঠল। চমকে উঠল প্রশান্ত। কোনো সন্দেহ নেই ও রতন। কি হয়েছে ওর? ওকে ঘিরেই বা এই ঝড় হচ্ছে কি করে! ঝড় যেন ওকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কিন্তু ঘটনাটা তো ওর চোখের সামনেই ঘটছে। এই ঝড়ের হাত থেকে প্রাণপণে মুক্তি পাবার চেষ্টাই করছে রতন, কিন্তু পারছে না। পারছে না ঝড়ের ঘূর্ণি থেকে বার হয়ে আসতে। আবার ও যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। কি করবে প্রশান্ত, ছুটে যাবে ওকে ধরতে! এসব কি হচ্ছে আজ এ বাড়িতে! তার মাঝে ওর কি এগোনো উচিত! প্রশান্ত কিছু ভাবার আগেই পাশ থেকে অবনীবাবু ছুটে বার হয়ে গেলেন। কোনো কিছু না ভেবেই উনি বোধহয় তাঁর ছেলেকে ধরতে যাচ্ছিলেন। পারলেন না। আচমকা ঘূর্ণির ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন একপাশে। আবারও করুণভাবে আর্তনাদ করে উঠল রতন। ওর বোধহয় আর ক্ষমতা নেই ওই অসম্ভবের সঙ্গে লড়ার।

তখুনি বাগানের অন্য আর একপাশের ঝরা পাতাগুলো হঠাৎ পাক খেয়ে উঠল। ওখানেও যেন আর একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হলো। মুহূর্তে সেটা প্রচণ্ড রূপ নিয়ে আছড়ে পড়ল আগের ঘূর্ণির ওপরে। কি যে হলো তা বুঝতে পারল না প্রশান্ত। বীভৎস এক আওয়াজে ওর কানে তালা ধরে গেল। চোখের সামনে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ চমকাল যেন, চোখ ধাঁধিয়ে গেল। হুঁশ ফিরতে দেখল বাগানের একটা গাছের নিচে পড়ে আছে রতন বেহুঁশ হয়ে। অন্য দিকে অবনীবাবু। অবনীবাবু কষ্ট করে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। প্রশান্ত ছুটে গেল রতনের কাছে। ঝুঁকে পড়ে দেখল ওর নিশ্বাস পড়ছে স্বাভাবিকভাবেই। তবে ও অজ্ঞান হয়ে গেছে।

পিছনে আলো নিয়ে ছুটে এল মালতী, তার পিছনে মাসীমা। দুজনের মুখে-চোখে আতঙ্কের ছায়া।

'কি হয়েছে এখানে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন মাসীমা।

'অমন বীভৎস আওয়াজ হলো কিসের?' জিজ্ঞেস করল মালতী।

প্রশান্ত বলল, 'তোমরা সরে দাঁড়াও, আমি রতনকে ঘরে নিয়ে যাই আগে, ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।'

'কেন, কেন, ওর হয়েছে কি?' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে মাসীমা বসে পড়লেন রতনের পাশে। যত্নে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার কিন্তু কিছুই ভাল মনে হচ্ছে না। ভূতে ভর করেছে ওকে। তোমরা ওঝা ডাক।'

রতনকে যত্ন করে দুহাতে তুলে নিল প্রশান্ত। বলল, 'আগে তো ওর জ্ঞান আসুক। তারপর যা করার করবেন।' বলে ওকে নিয়ে চলল ভিতর বাড়ির দিকে। পিছন পিছন মালতী আর মাসীমাও চললেন।

অবনীবাবু একা অন্ধকারে বাগানে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চাপা কান্নায় বললেন, 'ধরণী, ধরণী, তুই তো জানিস, আমি তোকে মেরে ফেলিনি। তবে কেন তুই আমার ছেলের এমন সর্বনাশ করছিস? দোহাই তোর, ওকে তুই ছেড়ে দে। ছেড়ে দে ওকে, আমি নয় গয়ায় গিয়ে তোর জন্য পিণ্ডি দেব।'

কথা ওঁর শেষ হলো কি হলো না, হাল্কা বাতাসে গাছের ঝরা পাতাগুলো আবার উড়তে লাগল। উড়ে উড়ে অন্ধকারের মাঝেই যেন একটা মানুষের রূপ নিল। শিস দেওয়ার মতো শব্দে ভেসে এল কথা, 'না-না, আ-আমি নয়। বি-বিশু শয়তান ওকে ভর করেছে। বিশু শয়তান। ওকে রক্ষা কর দাদা, র-রক্ষা কর।'

'কি বলছিস তুই,' চেঁচিয়ে উঠলেন অবনীবাবু, 'বিশু শয়তান! সে আবার কে? তাকে তাড়াব কি করে আমরা?'

'এখুনি রতনকে চ-চড়কডাঙার কালীমন্দিরে নিয়ে যাও। পুরোহিত গুণিন, তিনিই ও-ওকে রক্ষা করতে পারবেন। দেরি কর না। ওকে বাঁচাও।'

হাওয়া থেমে গেল। পাতাগুলো আবার ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলেন অবনীবাবু। বিছানায় শোওয়ান রতনকে তখন পাখার হাওয়া করছে মালতী। মাসীমা এক বাটি জল এনে ওর চোখে-মুখে ছিটোতে লাগলেন। কাতরভাবে ডাকতে লাগলেন, 'রতন, রতন, বাবা চোখ খোল।'

আস্তে আস্তে চোখ মেলল রতন। প্রশান্ত ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন বোধ করছ তুমি?'

ক্লান্তভাবে রতন বলল, 'আমি মরে যাব প্রশান্তদা, আমি মরে যাব। আমার যে কি হয় থেকে থেকে, আমি বুঝি না। আমার ভীষণ ভয় করছে। বাবা, মা, তোমরা আমার কাছে এসে দাঁড়াও। আমাকে ঘিরে দাঁড়াও। প্রশান্তদা, তুমিও কাছে এসো.....আমি তোর গলাটা টিপে ধরব। তুই এখানে কেন, কেন, কেন....' হঠাৎ আচমকা বিছানার উপরে উঠে বসল রতন। ওর মুখের চেহারা বদলে গেছে, বদলে গেছে গলার স্বর।

তিন লাফে পিছনে সরে গেল প্রশান্ত। এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ দেখল দেওয়ালে ঝুলছে একটা ক্যালেন্ডার, তাতে কালীর ছবি। কাঁপা হাতে সেটা দেওয়াল থেকে খুলে নিয়ে সামনে ধরে ও দাঁড়াল। কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি বিছানা থেকে উঠবে না, উঠবে না বলে দিলাম। উঠলেই এ ছবি আমি তোমার গলায় ঝুলিয়ে দেব। চুপ করে ওখানেই বসে থাক তুমি।'

হা-আ-ও করে বিশ্রী একটা আওয়াজ ছাড়ল রতন। দাঁতগুলো সব বার করে বলল, 'ছবির আড়ালে কতক্ষণ থাকবি তুই? তারপর? তারপর তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে না? ঘে-আ-ও, আমি খাটে বসে থাকতে পারছি না, আমি বাইরে যাব!'

চেঁচিয়ে প্রশান্ত বলল, 'মাসীমা, মালতী, আপনারা সরে আসুন ওর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি। ও এখন রতন নয়, ওর ভর হয়েছে। ও এখন যা খুশি তাই করতে পারে। সরে আসুন আপনারা।'

বারবার মাথা নাড়তে থাকলেন মাসীমা, বললেন, 'না, না, ওকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। ও তো রতন, আমার ছেলে। বাবা, তাকিয়ে দেখ, আমি—আমি, আমি, তোর মা।'

হেয়াউক করে একটা বিশ্রী আওয়াজ ছেড়ে রতন নেমে পড়ল বিছানা থেকে। দাঁতগুলো তেমনি করেই বার করে বলল, 'আমার সর্বনাশ করেছিস তোরা, তোদের সর্বনাশ করব আমি এক এক করে। এটাকে ধরেছি, এর পর ধরব মেয়েটাকে.....তারপর হি-হি-হিঃ।'

আতঙ্কে শিউরে উঠে মালতী ক'পা পিছিয়ে গেল।

অবনীবাবু কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি, তুমি কে? আমরা তোমার কি সর্বনাশ করেছি?'

'করিসনি সর্বনাশ? ভাইটাকে মারলি চিকিৎসার নামে, তাকে পোড়াবি বলে গাছ কাটলি বাগানের। তখন খেয়াল করলি না কি গাছ কাটলি?'

'একটা আমগাছ কাটা হয়েছিল।'

'তার পাশের আসশ্যাওড়া গাছটা কাটলি কেন?'

'আসশ্যাওড়া গাছটা না কাটলে যে আমগাছটা কাটা যাচ্ছিল না। তাই ওটাও কাটা হয়েছিল।'

'তোদের এই বাড়িটা যদি আমি এখন ভেঙে ফেলি। তোরা থাকবি কোথায়? না, না, ঠিক বললাম না, তোরা অন্য বাড়িতে যাবি। কিন্তু আমি?' হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে বীভৎসভাবে ককিয়ে উঠল রতন, 'উঁ-উঁ-উঁ-উঁ, আমি মাঠেঘাটে পগারে ভাগাড়ে ঘুরে মরব। আমার এত বড় সর্বনাশ করেছিস, আমি ছাড়ব না তোদের।' কথার শেষে থপথপ করে ও এগিয়ে চলল দরজার দিকে। মাসীমা হঠাৎ পাগলের মতো ওর পথ আগলে দাঁড়ালেন. বললেন, 'যাসনে রতন, যাসনে।'

শূন্য থেকে কাদার তালগুলো এসে ওর হাতে পড়ছে।

দুহাত ছুঁড়ে ধাক্কা দিয়ে মাসীমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বার হয়ে গেল রতন বাইরের ঘোর অন্ধকারের মাঝে।

প্রশান্ত ছুটে গিয়ে মাসীমাকে ধরে তুলল। বলল, 'লাগেনি তো আপনার? এখন যে আমাদের কি করা উচিত তা তো বুঝতেই পারছি না। ভূতে ভর করে শুনেছিলাম। বিশ্বাস করতাম না এতদিন। এখন, এ তো দেখছি সত্যি। কিন্তু তারপর.....'

'চড়কডাঙার কালীমন্দিরের পুরোহিতের কাছে যেতে হবে আমাদের এখুনি।' বললেন অবনীবাবু, 'তেমন আদেশই আমি পেয়েছি। কিন্তু রতনকে নিয়ে যাব কি করে?'

ওঁর কথা শেষ হতেই রতনের বীভৎস মুখটা দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিল। দাঁত বার করে হি হি করে হাসল ও। বলল, 'কোথায় যাবি? পথে আমি আছি না? আয়, আয়, আয় তোরা সবাই। আমাকে ঘরছাড়া করেছিস,তোরাও ঘরছাড়া হবি তাহলে, হি-হি-হিঃ।' থপথপ করে ও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, 'কার কাছে আদেশ পেলেন আপনি?'

'ধরণী এসেছিল, ও-ই বলে গেল। তা না হলে রতনকে আমরা আর বাঁচাতে পারব না।'

'কে এসেছিল?' অবাক প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, 'ধরণী! তিনি তো আপনার ভাই, মৃত।'

'হ্যাঁ, সেই এসেছিল, বলল, রতনের উপরে বদ আত্মার ভর হয়েছে। ওকে মেরেই ফেলবে সে আত্মা।'

মালতী আতঙ্কে বলল, 'কিন্তু আমরা যাব কি করে? ও তো বলে গেল পথে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'যেতে আমাদের হবেই, আর তা এখুনি,' বললেন অবনীবাবু, 'নইলে রতনকে হয়তো বাঁচাতে পারব না।'

মাসীমা করুণভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'যেতে কি সবাইকেই হবে নাকি?'

'তা না হলে কাকে রেখে কাকে নিয়ে যাব? কার কপালে যে কি আছে তা তো জানি না। সবার এখন একসঙ্গেই থাকা উচিত।' বললেন অবনীবাবু।

'কিন্তু আমরা যাব কি করে?' কাঁপা গলায় আবার মালতী জিজ্ঞেস করল।

প্রশান্ত এতক্ষণ কি যেন ভাবছিল। বলল, 'মাসীমা, আপনার ঠাকুরঘরে অনেক দেবদেবীর মূর্তি-ফটো আছে না? তার এক একটা আমরা এক একজন সঙ্গে রাখব। তাতে ও আর যাই করুক আমাদের ধরতে পারবে না। প্রাণের ভয় থাকবে না তাহলে আমাদের। চলুন এখুনি আমরা ঠাকুরঘরে যাই।'

কথার শেষে প্রায় ছুটেই চলল ওরা ঠাকুরঘরের দিকে। অন্ধকার বারান্দার শেষে একটা বড় দরদালান, তারই একদিকে ঠাকুরঘরের দরজাটা খোলা। বারান্দা দিয়ে হুড়মুড় করে ওরা দরদালানে এসে পৌঁছাল। মালতী সবার আগে। এক পা এগিয়েই ও আর্তনাদ করে উঠল। সামনেই কড়িকাঠ থেকে দড়িতে ঝুলছে রতন। দুলছে,

ঘুরছে ওর দেহটা। ওদের দিকে ফিরেই ও আবার বিশ্রীভাবে হেসে উঠল, বলল, 'অত সহজে আমি ছাড়ব না। অত সহজ নয় যা কিছু তাই করা। হি-হি হিঃ।'

এক ছুটে প্রশান্ত আবার পিছনের বারান্দায় ফিরে গেল। অন্ধকারে পাগলের মতো সেই কালীর ছবিওলা ক্যালেন্ডারখানা খুঁজতে লাগল।

দরদালান থেকে আবার ভেসে এলো মালতীর আর্তনাদ। সেই সঙ্গে অবনীবাবুর করুণ চিৎকার, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওকে তুমি। কেন তুমি এমন করছ, দোহাই, ওকে ছেড়ে দাও।' ওঁর কথার শেষে আবার সেই বীভৎস হাসি গোটা বাড়িটা কাঁপিয়ে তুলল, হা-হা-হাঃ।

ক্যালেন্ডারের ছবিখানা সামনে ধরে ছুটে দরদালানে হাজির হলো প্রশান্ত। দেখল মালতীর অবশ দেহটা দুহাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছে রতন। সব ভয় মন থেকে তাড়াল প্রশান্ত। পাশের দেওয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা অবনীবাবুর বেড়াবার লাঠিখানা তুলে নিয়ে এক হাতে ছবিটা সামনে ধরে এগিয়ে গেল রতনের দিকে। মুখে বলল, 'যা, যা এখন থেকে তুই। না গেলে তোকে আমি কালীর পায়ে আছড়ে ফেলব।' কথার শেষে কালীর ছবিটা ও রতনের গায়ে ঠেকিয়ে দিতে গেল।

মালতীকে ছুঁড়ে ফেল দিল রতন। দু হাত এলোধাবাড়িভাবে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠল, যেন ও-ও ভয় পেয়েছে। আরও একটু সাহস হলো প্রশান্তর। ছবিটা আবার সামনে এগিয়ে ধরে আরও এগিয়ে গেল ওর দিকে। বলল, 'চলে যা, চলে যা তুই এখান থেকে। গেলি?'

ছবিটা ওর চোখের সামনে তুলে ধরতেই রতন চেঁচিয়ে উঠে এক হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল। সেই অবস্থাতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে থপথপ করে বাইরের দরজা দিয়ে অন্ধকারে বার হয়ে গেল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসবি না, আসবি না তোরা পথে? আয় আয়।'

মুখে-চোখে জল দিতেই সুস্থ হলো মালতী। আর দেরি করল না ওরা। পুজোর ঘরে ঢুকল গিয়ে সবাই। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে লাগল। যেন গোটা পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। তার মাঝে সেই বিকট গলার গর্জন, রাগে যেন ফুঁসছে একশটা সিংহ একসঙ্গে।

মাসীমা বললেন, 'এখন কি হবে বাবা?'

অবনীবাবু বললেন, 'সেই যে সেবারে আমরা সবাই বাবা ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে গেছিলাম, তখন তো প্রসাদী ফুলের সঙ্গে বাবার পবিত্র তাগাও দিয়েছিলেন পুরোহিতমশাই। তার কি কটা আছে এখনও?'

মাসীমা কুলুঙ্গির ঝাঁপি নামালেন। তার মধ্যে বেশ কটা পবিত্র তাগা পাওয়া গেল। প্রশান্ত এক একটা করে সবার হাতে তা বেঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বীভৎস আওয়াজ সব থেমে গেল।

প্রশান্ত বলল, 'তবুও বলি মাসীমা, আপনার ছোট দেবদেবী মূর্তিগুলোর এক একটা আমরা সঙ্গে রাখি। কি থেকে কি হয় তা তো বলা যায় না।'

ছোট্ট একটা ধাতুর কালীমূর্তি প্রশান্ত মালতীর গলায় দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। অন্য সবাই এক একটা ছোট্ট মূর্তি তুলে নিলেন। মাসীমা তাঁরটা আঁচলে বাঁধলেন। অবনীবাবু জামার পকেটে রাখলেন।

প্রশান্ত এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু খুঁজছিল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখা মহাদেবের একটা ছোট্ট লোহার ত্রিশূলের দিকে। সেটাও ও হাতে তুলে নিল। বলল, 'আপনারা সবাই এ-ঘরেই বসে থাকুন। আমি ও-ঘর থেকে টর্চ বাতিটা নিয়ে আসি। অন্ধকারে তা না হলে যাব কি করে?'

কেউ কিছু বলার আগেই দরজাটা খুলে ফেলল ও। খোলা দরজা দিয়ে দরদালানের এদিক ওদিক ভাল করে দেখল। না, শয়তানটা কাছেপিঠে নেই। বাইরে বার হয়ে ও ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। কাঁপা বুকে ত্রিশূলটা বাগিয়ে ধরে একটু একটু করে পা ফেলে ও এগোল। ক'পা এগিয়েছে, হঠাৎ সামনে ফের বাতাসের ঘূর্ণি লাগল। জমাটবাঁধা ঠাণ্ডা বাতাস ঘুরপাক খেয়ে আস্তে আস্তে আবছা কিছুর রূপ নিচ্ছে। কেন যেন ভয় হলো না প্রশান্তর। বড় বড় চোখ করে তাকিয়েই রইল। সেই জমাট বাতাস রূপ নিল এক সুন্দর সুপুরুষের। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না প্রশান্ত। এও কি প্রেত-আত্মা!

ছায়ামূর্তি ফিসফিসিয়ে বলল, 'ও—ওকে ভয় পেও না। রতনকে বাঁ—বাঁচাও।'

'কে আপনি?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

'ধ-ধ-ধ-র-ণী।'

'ধরণী! আপনার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?' জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

'বি-বি-বিশু, বিশু শয়তান।'

'বিশু! সে আবার কে?'

'সে-সে-ই তো র-রতনকে ভর করেছে।'

'সে আপনাকে মারল কি করে?'

'অ-অ-সুখের মাঝে ভ-ভর করে।'

'কিন্তু কেন সে মারল আপনাকে?'

'আ-আমি যে ও-ওকে মেরেছিলা-লাম, তাই।'

'আপনার আগে থেকেই আসশ্যাওড়া গাছে থাকত ও। তাকে আপনি মারলেন কি করে?'

'আ-আমি বু-বুঝতে পে-এ-এরে ছিলাম, তাই গু-গু-গুণিন ডে-ডেকেছিলাম। সে ও-ওকে খুব ক-ষ্ট দেয়। তা-তাড়াতে পা-পারে না। তা-তাই ওর রাগ আ-মার উ-উপরে।'

'আমরা ওকে তাড়াতে পারব?'

'তু-তুমি পারবে। তোমাকে তা-ই ও দে-দে-দেখতে পারে না।'

'আমি ওকে তাড়াতে পারব?'

'হ্যাঁ-এ্যা-এ্যা। কালী মো—মন্দিরের পু-পু-পু-রোহিত, তার সা-সাহায্য না-না-নাও।'

আস্তে আস্তে হাওয়ায় মূর্তিটা মিলিয়ে গেল। চমকে হুঁশ ফিরে পেল প্রশান্ত। ছুটে শোবার ঘরে ঢুকে চার ব্যাটারীর বড় টর্চটা হাতে তুলে নিল। এদিক ওদিক খুঁজে ছোট টর্চটাও নিল পকেটে। তারপর আবার এক হাতে ত্রিশূলটা বাগিয়ে ধরে ফিরে চলল ঠাকুরঘরের দিকে।

ঘর থেকে বার হতেই ওর মনে হলো, ছায়ার মতো কে যেন ওর পিছন পিছন চলছে। মনে যথেষ্ট জোর এনে ও থমকে দাঁড়াল, পিছনে ফিরে বলল, 'তুমি যেখানেই থাক শুনে রাখ, এখন থেকে তোমাকে আর আমি ভয় পাব না। সঙ্গে আমার দেবীমূর্তি আছে। হাতে বাঁধা মন্ত্রপূত তাগা। তোমার সাহস থাকে তো সামনে এসো। এসো সামনে।' বলে শূন্যে দুবার ত্রিশূলটা আছড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, যে ওর পিছন পিছন আসছিল, সে যেন সরে গেল।

ছুটে ও ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়ল। দরজায় আওয়াজ হতেই মালতী আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছিল। প্রশান্তকে দেখে মাসীমা কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি কোথাও যাব না, কোথাও যাব না বাবা। আমি আর ওকে দেখতেই পারব না। আমার ভীষণ ভয় করছে।'

প্রশান্ত বলল, 'বেশ তো মাসীমা, আপনি না হয় মালতীকে নিয়ে ঠাকুরঘরেই বসে থাকুন। আমি আর মেসোমশাই কালীমন্দিরে যাচ্ছি। কিন্তু কথা দিন, কোনো অবস্থাতেই আপনারা ঘর থেকে বার হবেন না। যতক্ষণ না আমি আর মেসোমশাই এসে আপনাদের ঠাকুরের মূর্তিগুলো দেখাচ্ছি, ততক্ষণ।'

মাসীমা বললেন, 'বেশ, তাই হবে বাবা।'

অবনীবাবু বললেন, 'প্রশান্ত কি বলল, বুঝেছ? আমরা এসে তোমাদের আমাদের সঙ্গে নেওয়া ঠাকুরের মূর্তিগুলো আগে দেখাব। তবে তোমরা আমাদের কথা শুনে কাজ করবে। তা না হলে যেই আসুক, যাই কেন বলুক না, তোমরা কখনও এ-ঘর থেকে বার হবে না।"

'বুঝেছি।' বললেন মাসীমা, 'এর যে কখন শেষ হবে, হায় ভগবান!'

প্রশান্ত আর অবনীবাবু দুজনে দুটো টর্চ নিল। বড়টা অবনীবাবুর হাতে। ছোটটা প্রশান্তর পকেটে। ঠাকুরঘরের দরজা খুলে দুজনেই দরদালানে বার হলো। প্রশান্ত ডেকে বলল, 'ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিন মাসীমা।'

মাসীমা উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিতেই ওরা দুজনে বাইরের দরজার দিকে এগোল। বাগানের সামনে এসে প্রশান্ত বলল, 'মেসোমশাই, মনে রাখবেন আপনার সঙ্গে দেবতার মূর্তি আছে। হাতে বাঁধা আছে পবিত্র তাগা, মিছিমিছি কিছুতেই ভয় পাবেন না। সামনে যে কোথায় কি হবে তা তো আমরা জানি না।'

দরজা দিয়ে দুজনেই বাগানে নামল। সেখানে যেন কিছুক্ষণ আগেই ঝড়ের তাণ্ডব হয়ে গেছে। গাছপালার ভাঙা ডালপালা চারদিকে ছড়ান। ফুলের টবগুলো উল্টে রয়েছে এখানে ওখানে। বাগানের ফটকটা হাঁ করে খোলা।

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে দূরের পথ মিলিয়ে গেছে। কাঁপা গলায় প্রশান্ত বলল, 'আলো জ্বালুন।'

'না, না, কথা আছে, শুনুন।' সামনের ঝোপের আড়াল থেকে কার যেন গলা শোনা গেল। অন্ধকারেই সে ঝোপের আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। অবনীবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আরে তুমি প্রতাপ না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বললেন প্রতাপবাবু, 'বাগানে আপনাদের তাণ্ডব হচ্ছে দেখে ছুটে আসছিলাম। ব্যাপার কি বলুন তো?'

অবনীবাবু প্রশান্তর দিকে ফিরে বললেন, 'একে তো চেন না তুমি। আমাদের প্রতিবেশী। একে তো তুমি দেখেছ প্রতাপ, এখানে আজকাল থাকে।'

'জানি, জানি।' বললেন প্রতাপবাবু, 'কিন্তু এদিকের ব্যাপার কি বলুন তো? এসব কি হয়েছে এখানে?

'চল, এগোও।' বললেন অবনীবাবু, 'এসেছ যখন সঙ্গে থাক। আমরা বড়ই বিপদে পড়েছি। মানে, রতনের উপরে একটা বদ আত্মার ভর হয়েছে, সে-ই এসব করছে।'

'প্রেত-আত্মা!' আতঙ্কভরা গলায় বললেন প্রতাপবাবু, 'বলেন কি! রতনকে তো আমি এই কিছুক্ষণ আগে ভুবনডাঙার দহের দিকে যেতে দেখলাম। ডাকলাম, জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? বলল, আমার ভাল লাগছে না, দহের দিকে যাচ্ছি।'

প্রশান্ত বলল, 'তার গলা চিনতে পেরেছিলেন?'

'মানে?' অবাক হয়ে তাকালেন প্রতাপবাবু, 'তাকে আমি তো জন্ম ইস্তক দেখছি, তার গলা চিনব না!'

প্রশান্ত চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন দিকে দহ? শীগগির চলুন, সে আবার না অন্য কিছু করে বসে!'

'এই দিকে, এই দিকে', বললেন প্রতাপবাবু।

ওরা প্রায় ছুটতেই লাগল সেদিকে। চলতে চলতে প্রতাপবাবু

বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে, ভর হলে ঘুরিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে মারে। তেমন কিছু ভয় পাচ্ছেন নাকি আপনারা?'

ছুটতে ছুটতে ওরা গ্রাম ছাড়িয়ে খোলা মাঠের ধারে এসে পৌঁছল। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে, আবার চাষের জন্য জমি তৈরি হচ্ছে। সামনে যতদূর দেখা গেল কেউ কোথাও নেই।

অবনীবাবু প্রায় কেঁদেই ফেললেন, বললেন, 'প্রতাপ, তুমি তাকে কি এদিকেই আসতে দেখেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা নয় তো কি মিথ্যা কথা বলছি!'

একটা ঝোপ পার হতেই সামনে দূরে অনেকটা জুড়ে দহটা দেখা গেল। তার ধার ঘেঁষে জায়গায় জায়গায় নলখাগড়ার ঝোপ। এগিয়ে গিয়ে দুহাতে ঝোপ সরিয়ে দেখতে লাগল প্রশান্ত। ভুলেই গেল সাপের কথা। কিছুক্ষণ এগিয়েই ও থমকে দাঁড়াল। একটা ঝোপের ভিতর আধখানা দেহ জলে, আধখানা ডাঙায় রতন পড়ে আছে। মাথার দিকটাই ওর জমিতে। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন অবনীবাবু। প্রশান্ত ঝুঁকে পড়ে হাতের ত্রিশূল নামিয়ে রেখে রতনের দেহটা দুহাতে তুলে আনল পথের ধারে। দেহটা ছুঁয়েই বুঝেছে রতন মরেনি বেঁচেই আছে। শক্ত গলায় বলল ও, 'এখন কাঁদবেন না মেসোমশাই, ও বেঁচেই আছে। প্রতাপবাবু, আপনি আপনার রুমাল ভিজিয়ে একটু জল আনুন তো। মাথাটা ওর মুছিয়ে দি।'

'বেঁচে আছে!' দু পা পিছিয়ে গেলেন প্রতাপবাবু, 'হি হি হিঃ, বেঁচেই তো থাকবে। এখনও অনেক খেলা বাকী।'

থমকে অবনীবাবু তাকালেন প্রতাপবাবুর দিকে। প্রশান্ত ছুটে গিয়ে মাটিতে পড়ে-থাকা ত্রিশূলটা তুলে বাগিয়ে ধরে বলল, 'তুমি কে? কে তুমি? কি চাও এখানে?'

আস্তে আস্তে পিছতে লাগলেন প্রতাপবাবু, মুখের হাসি ওঁর তেমনি রইল। বললেন, 'আমি কে দেখবি তুই, দেখ!'

কথার শেষে শূন্যেই যেন মিলিয়ে গেলেন উনি। ভাল করে কিছু বোঝার আগেই মাটিতে শোওয়া রতন ককিয়ে কেঁদে উঠল। অবনীবাবু ওকে তুলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। রতন বলল, 'বাবা বাবা,আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও আমাকে, তা না হলে ও আমাকে মেরে ফেলবে।'

'কোনো ভয় নেই তোমার, তুমি আমার বুকের মধ্যে আছ,' বললেন অবনীবাবু, 'আমার কাছে দেবতার মূর্তি আছে। তুমি আমাকে ধরে থাক, ও তাহলে আর তোমাকে ধরতেই পারবে না।'

প্রশান্ত বলল, 'বাড়তি একটা তাগা আমি এনেছি সঙ্গে করে। আমি রতনকে ধরে থাকছি, আপনি সেটা ওর হাতে বেঁধে দিন। তাহলে আর কোনো ভয় থাকবে না।'

যত্ন করে তাগাটা অবনীবাবু বেঁধে দিলেন রতনের হাতে। বললেন, 'আর তোর কোনো ভয় নেই রে। তুই শুধু ভগবানের নাম নে। মা কালীর নাম।'

হাতের তাগাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল রতন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসল ও। বলল, 'সারা গায়ে আমার বিষম ব্যথা বাবা। প্রশান্তদা, তুমি আমাকে ধর, আমি তাহলে আস্তে আস্তে হাঁটতে পারব।'

প্রশান্ত বলল, 'আমরা কিন্তু এখন চড়কডাঙার কালীবাড়িতে যাব। তোমাকে কষ্ট করে যেতে হবে। বুঝলে?'

রতন বলল, 'যাব, তুমি প্রশান্তদা যেখানে যেতে বলবে, সেখানেই আমি যাব। আমাকে তুমি মাপ কর, কি করতে কি করছি তা তো জানি না!'

প্রশান্ত বলল, 'ওসব কথা থাক। আলো ছাড়া আমরা আর এক পা-ও এগোব না। রতন, তুমি ছোট টর্চটা ধর। মেসোমশাইয়ের কাছে বড়টা আছে। পালা করে দুজনে দুটো জ্বালবে। চল, এগোই আমরা। কোন দিকে চড়কডাঙা?'

ঘুরপথে ওরা যখন আবার চড়কডাঙার পথ ধরল তখন রাত গভীর। থেকে থেকে আলো জ্বালছিলেন অবনীবাবু। কখনও কখনও রতনও। ভয়ের কোনো কিছুই কোথাও নেই। সোজা পথটা লাইনের ধার পর্যন্ত গিয়ে বাঁক নিয়েছে। সেখানে বাঁকের মুখে ঘন ঝোপজঙ্গলের মাঝে পথটা হারিয়ে গেছে।

লাইন বরাবর এগিয়ে অবনীবাবু থমকে দাঁড়ালেন। ওঁরা স্পষ্ট শুনতে পেলেন সামনে পথের বাঁকে কোথায় যেন থেকে থেকে আওয়াজ উঠছে, থপ....থপ।

ভয়ে কাঁপতে শুরু করল রতন। কাঁপা গলায় বলল, 'ও বোধহয় ওখানে আছে। আমাকে দেখলেই আবার ধরবে।'

প্রশান্ত একথা শুনে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'সামনে কি যে হচ্ছে জানি না, কি যে হবে তাও জানা নেই। রতন, একটা কথা তুমি ভাল করে বোঝ, তোমার হাতে দেবতার পবিত্র তাগা বাঁধা আছে। তুমি না হয় তোমার বাবাকেও শক্ত করে ধরে থাক। দেবতার সামনে ওরা কেউই আর এগোতে পারবে না, ও আর কোনোদিনও তোমাকে ধরতে পারবে না।'

'তবু আমার ভয় করছে।' কাঁপা গলায় কাঁপতে কাঁপতে বলল রতন, 'বাবা, তুমি আমাকে শক্ত করে ধর।'

অবনীবাবু ওকে ধরে দাঁড়ালেন। সেদিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বলল, 'বেশ, আপনারা এখানেই এমনিভাবে দাড়িয়ে থাকুন। আমি এগিয়ে দেখছি ব্যাপার কি।'

কথার শেষে ত্রিশূলটা আবার সামনে বাগিয়ে ধরে পায়ে পায়ে এগোল প্রশান্ত। ঝোপটা পার হয়েই বাঁকের ধারে থমকে দাঁড়াল। রেলের ক্রসিংয়ের ঝাঁকড়াচুলো লম্বা দাড়ি গেটম্যানটা রেলের কালো উর্দি পরে কোথা থেকে তাল তাল কাদা এনে থপথপ করে ফেলে পথের মাঝে একটা বাঁধ তুলছে। হাত বাড়াতেই শূন্য থেকে কাদার তালগুলো এসে ওর হাতে পড়ছে। এক

একটার ওজন বেশ কয়েক কেজি। মুখ তুলে ও দাঁত বার করে হাসল, বলল, 'পার হয়ে যাবে যাও দেখি? হি হি হিঃ—সে সাহস আর তোদের হবে না।'

থমকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল প্রশান্ত। কি যে এখন করা উচিত তা ও বুঝেই পেল না। রাস্তার যেখানে কাদার বাঁধ দেওয়া হয়েছে তার একপাশে খাড়া খাদ, সেদিকে নেমে যাওয়া যাবে না। অন্য পাশে ঢালু জমির শেষে উঁচু-নিচু জমি। কি যে আছে সেখানে কে জানে! সেদিক দিয়েই নেমে ওদের বাঁধটা পার হয়ে যেতে হবে এখন।

গেটম্যান আবার ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে বলল, 'আয় আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয় চলে, অনেক দিন পেটভরে কিছু খাইনি। হাড় খাব, মাস খাব, চুক-চুক-চুক রক্ত খাব। হি হি হিঃ—আজকে আমার কি ফুর্তি!'

ছুটতে ছুটতে প্রশান্ত অবনীবাবুদের কাছে ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কোনো দিকে তাকাবেন না আপনারা, আমার পিছন পিছন আসবেন। কে কি করছে কে কি বলল, কিছুই দেখার বা শোনার দরকার নেই। মনে রাখবেন আমাদের ভয় দেখাতে পারে ওরা, কিন্তু আমাদের আর ছুঁতে পারবে না।'

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সামনে ও শব্দ কিসের?'

'আত্মাটা গেটম্যানের রূপ ধরে কাদার পাঁচিল তুলছে। আমরা পাশ দিয়ে নেমে যাব।' কথার শেষে শক্ত করে রতনের হাত ধরল প্রশান্ত এক হাতে, অন্য হাতে ত্রিশূলটা বাগিয়ে ধরে এগোল বাঁকের দিকে, বলল, 'আসুন মেসোমশাই পিছন পিছন।'

হাতের মুঠোর মধ্যে রতন কাঁপছিল থরথর করে। বাঁক ফিরেই দেখল প্রশান্ত, কাদার বাঁধের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গেটম্যানটা, ওর দুটো চোখে আগুন জ্বলছে। সব দাঁতগুলো জানোয়ারের মতো বার করা। হাত দুটো দুপাশে বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে, সে হাতের আঙুলের নখগুলো সব ধারাল। মুখ দিয়ে বিশ্রী একটা আওয়াজ তুলে গেটম্যানটা বলল, 'রতন, রতন, রতন, আয় চলে আয়। আয় চলে আয়। আয় বলছি।' বলার শেষে ও একটা হাত বাড়িয়ে দিল রতনের দিকে। এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'তোর আত্মাটা তো আমার হাতের মুঠোয় ছিল রে! আবার ওটা আমি হাতের মুঠোয় পুরে ফেলব। কেউ বাধা দিতে পারবে না রে। আয়, আয়, চলে আয় বলছি।' কথার শেষে বাড়ানো হাতটা আরও বাড়িয়ে এক পা ও আরও এগিয়ে এল।

মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে স্মরণ করে প্রশান্ত চেঁচিয়ে উঠল, 'তবে রে।' কথার শেষে রতনকে ছেড়ে দিয়ে দু হাতে ত্রিশূলটা বাগিয়ে ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে গেটম্যানের বাড়ান হাতের ওপরে এক বাড়ি বসাল।

একটা বীভৎস আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঘন দুর্গন্ধ ধোঁয়ায় ভরে গেল চারদিক। বিষমভাবে কাশতে আরম্ভ করল ওরা। তার মাঝেই রতনের হাতটা আবার শক্ত করে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশান্ত বলল, 'পথের ডান দিকে নেমে পড়ুন মেসোমশাই, ডান দিকে, ওদিক দিয়েই কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ফের আমরা পথটা ধরব।'

হুড়মুড় করে ওরা সবাই নেমে পড়ল পাশের এবড়োখেবড়ো জমিতে। সভয়ে অবনীবাবু বললেন, 'প্রশান্ত, এ তুমি কোথায় নামলে? এ তো দেখছি কবরখানা!'

ওঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে এদিক ওদিক চারদিকেই কবরের গর্তগুলো যেন ফেটে যেতে লাগল। তার মাঝ থেকে বার হয়ে আসতে থাকল বীভৎস সব মূর্তি, কারও দেহ আধা-কঙ্কাল, কেউ পুরো কঙ্কাল, কারও আধখানা মাথায় চুল, কারও মাথাটাই নেই। সবাই ওরা হাসছে। সে হাসিতে চারদিক কাঁপছে। সামনের কঙ্কালটা বলল, 'ওঁরে, ওঁরা নেমেছেঁ রেঁ।' কথার শেষে ওর দাঁতের খটখটে আওয়াজ উঠল।

আধখানা কঙ্কালটা বলল, 'ধঁরবি নাঁকি রেঁ?'

হি হি করে হেসে ওরা ওদের ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করল। কে যেন বলল, 'ধঁর ধঁর ধঁর।'

ত্রিশূলটা বাগিয়ে রুখে দাঁড়াল প্রশান্ত। বলল, 'আয়, এগিয়ে আয় দেখি কার কত সাহস!' কথার শেষে হাতের ত্রিশূলটা বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগল ও। চেঁচিয়ে বলল, 'থামবেন না, থামাবেন না, এগিয়ে চলুন, ওরা কেউই কিছুই করতে পারবে না আমাদের।' এক হাতে আবার রতনকে ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চলল প্রশান্ত। চারপাশের ওরা সবাই সভয়ে সরে যেতে লাগল। আবার পাকা পথে উঠে পড়ল ওরা। কাঁপা গলায় রতন বলল, 'আমি জল খাব। আমি আর হাঁটতে পারছি না।'

ধমকে প্রশান্ত বলল, 'এখন ওসব কথা বলবে না। এখন আর থামা চলবে না। সোজা গিয়ে থামব মন্দিরে। যত কষ্টই হোক তোমার, তোমাকে চলতেই হবে।'

[চলবে]

ছবিঃ বিজন কর্মকার

ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স (গত সংখ্যার পর)

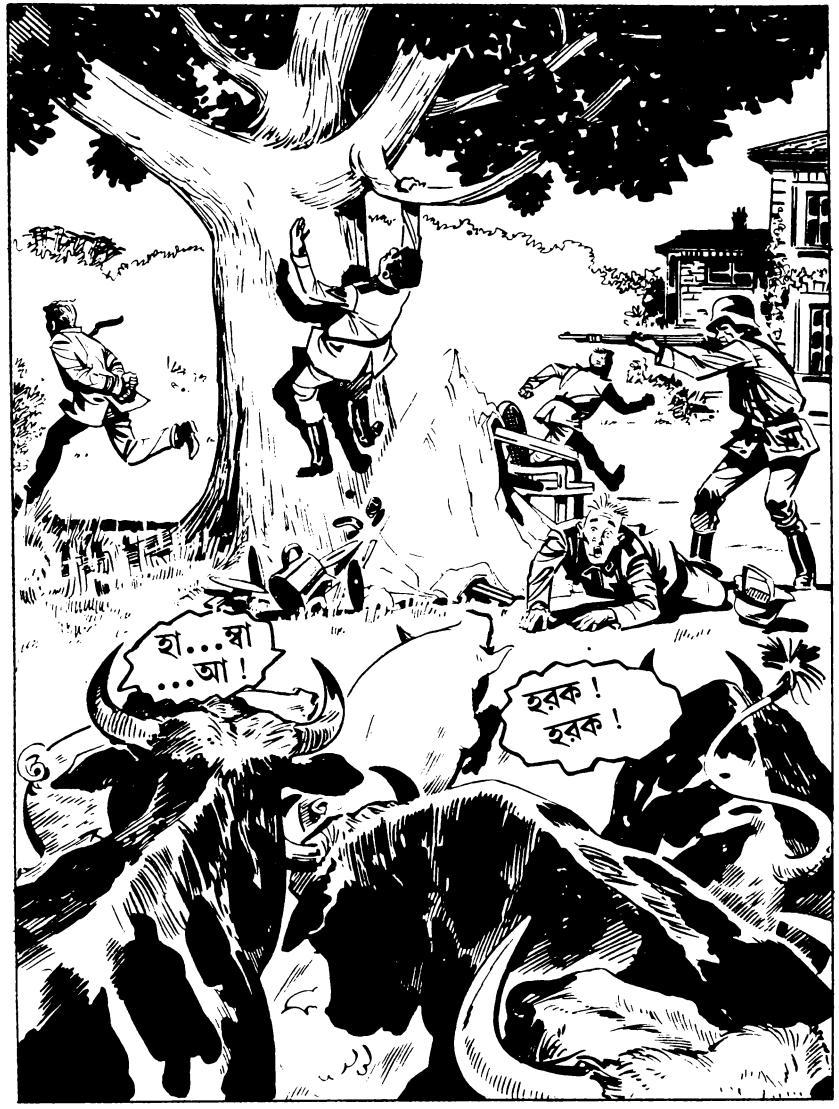

গার্ড আবার গুলি ছোঁড়ার আগেই.....
আ...আ !
উ...উ
উ...ফ
হরক !
হরক !

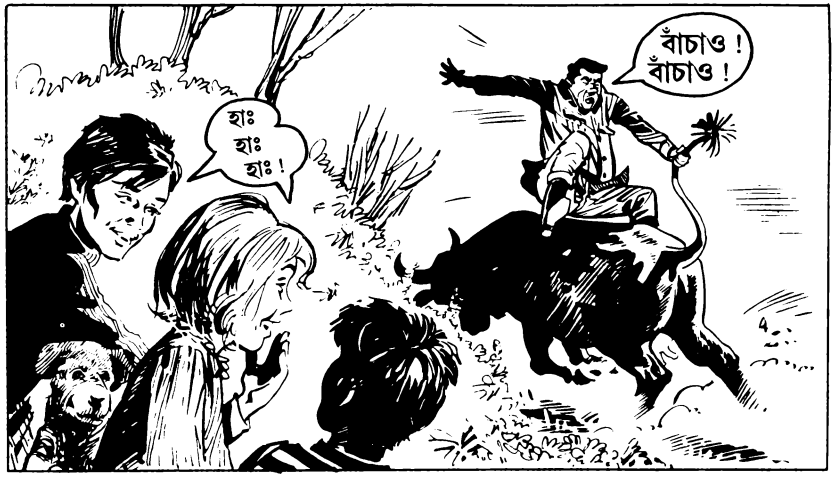
বাঁচাও !
বাঁচাও !
হাঃ
হাঃ
হাঃ !

শোন, আমার মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা প্ল্যান করে ঘটানো হলো ইংলিশ-ম্যানকে উদ্ধার করার জন্যে। ঐ মেয়েটা নির্ঘাৎ সিক্রেট এজেন্ট।
ঠিক বলেছিস পেরি। চল ওদের ফলো করি। দরকার হলে সাহায্য করবো।

ঝোপের আড়ালে ম্যাম'জেল তখন খুব ব্যস্ত....
তুমি বুড়ির মতো ভাব করে গার্ডদের পাশ দিয়ে হেঁটে বাইরে চলে যাবে। ওরা ভাববে একটু আগে ওরা যে বুড়িকে আসতে দিয়েছিলো সে তুমিই। সাহস রাখো, তুমি নিশ্চয়ই পারবে। গুলি লাগার কষ্ট একটু সহ্য করো।
ভেবো না! আমি নিশ্চয়ই পারবো!

এই বুড়ি, ওখানে অতো কিসের গোলমাল, কিছু হয়েছে নাকি ?
গরু আর শুয়োরগুলো ঢুকে পড়েছে। সার্জেন্টকে তাড়া করেছে। আমি দেখলাম সার্জেন্ট একটা গরুর পিঠে বসে আছে।
(চলবে)

রাম-লক্ষ্মণ

মঞ্জিল সেন

শুভ্র আর অভ্র ধর্মতলা বাঁস গুমটি থেকে উত্তরবঙ্গ পরিবহনের একটা বাসে উঠল। রকেট বাস, খুব জোরে নাকি যায়। রাত আটটায় ছেড়ে পরদিন সকালে পৌঁছোয়।

শুভ্র আর অভ্র থাকে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে। ছোটবেলা থেকেই ওদের ভাব, তারপর একসঙ্গেই হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। এ বছর ওরা স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার পর অখণ্ড অবসর, তাই ওরা চলেছে বেড়াতে। জলপাইগুড়ির ডি.এম. হলেন শুভ্রর পিসেমশাই। তাঁর ওখানেই ওরা যাচ্ছে। পিসেমশাই লোভ দেখিয়েছেন, ওখানে বেড়াতে গেলে তিনি অনেক জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবেন, যেমন জলদাপাড়া আর গরুমারা অভয়ারণ্য। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের গণ্ডার বিখ্যাত। তা ছাড়া হাতি তো আছেই। কাছেই ভুটান। সেখানেও বেড়িয়ে আনার কথা দিয়েছেন শুভ্রর পিসেমশাই।

ওদের দুজনেরই বয়স পনের। ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের ওরা মেম্বার। শুভ্রর বাবা অর্থদপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি আর অভ্রর বাবা একটা নামী কোম্পানির ডিরেক্টর। ছেলেদের সবদিক দিয়ে চৌকস করে তোলার দিকে তাঁরা কার্পণ্য করেননি। দুই বন্ধুর রাইফেল শুটিংয়ে খুব ভাল হাত হয়েছে, ওদের একটা করে টুয়েলভ বোরের বন্দুক আছে। আরেকটু বড় হলে পয়েন্ট

থ্রি ওয়ান ফাইভ বন্দুক কিনে দেবেন—কথা দিয়েছেন ওদের দুজনের বাবা। ওই বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করা যায়।

রাত্রে ওদের ঘুম হলো না। একভাবে বসে থাকতে থাকতে কোমর ব্যথা হয়ে যায়, ভীষণ অস্বস্তি। ফরাক্কার ওপর দিয়ে যখন বাস যাচ্ছিল তখন চারদিকে যেন আলোর মালা। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল আর জল। ওদের মনে হলো ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা এমন সুন্দর কাজ করেছেন যার জন্য গর্ব করা যায়।

ভোরের দিকে যতই ওরা শিলিগুড়ির কাছাকাছি হতে লাগল, চোখে পড়ল চায়ের বাগান। ওদের ধারণা ছিল পাহাড়ের ঢালু গায়েই চা গাছ হয়, কিন্তু এখানে সমতল ভূমিতেও চায়ের বাগান দেখে ওরা অবাক হলো। বাস থেকেই দেখা যায় কুলি-কামিনরা পিঠে একটা ঝুড়ির মতো বেঁধে চায়ের পাতা তুলছে আর পেছন দিকে ঝুড়িতে ফেলছে।

জলপাইগুড়ির বাস গুমটিতে শুভ্রর পিসেমশাই গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। ছেলে চন্দনের বয়স দশ আর মেয়ে সৌরভীর ছয়। ওরা দুজনেই কার্শিয়ঙে নামী স্কুলে পড়ে, বোর্ডিংয়ে থাকে। ছুটিতে এসেছে। ওরাও এসেছিল শুভ্রদের নিয়ে যেতে।

জলপাইগুড়ি শহরটাকে খুব ভাল লাগল অভ্রদের। শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা নদী, নাম করলা। পশ্চিমবাংলার আর কোথাও শহরের মাঝখান দিয়ে এমন নদী নেই। শিকারপুর বনে মাটির নিচ থেকে উঠে আসা জলধারা হলো করলা নদীর উৎস। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে পুবে তিস্তা নদীতে গিয়ে মিশেছে।

কয়েকদিন জলপাইগুড়িতেই কাটল। এর মধ্যে একদিন আচমকা বৃষ্টি নামল। এখানে নাকি হঠাৎ যেমন বৃষ্টি নামে, তেমনি থামেও হঠাৎ। সারা রাত বৃষ্টি হলো, ভোরেও থামার লক্ষণ নেই। তারপরই যেন যাদুমন্ত্রবলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। চন্দন ওদের ডেকে বলল,'এসো একটা জিনিস দেখবে।'

দোতলার ছাদে গিয়ে ও আঙুল দিয়ে দেখালো। বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল দুই বন্ধু। দূরে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার গিরিশৃঙ্গ, পরিষ্কার, ঝকঝকে, ঠিক যেন সোনার বরণ। অপূর্ব সুন্দর সে দৃশ্য, চোখ ফেরানো যায় না। ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল।

[দুই]

একদিন ওরা চলল গরুমারা অভয়ারণ্য দেখতে। শুভ্রর পিসেমশাই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ওখানে দিনকয়েক থেকে দুই বন্ধু যাবে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে। দু' জায়গাতেই ফরেস্ট অফিসারদের কাছে খবর চলে গেছে। জেলাশাসকের অনুরোধ অনেকটা হুকুমই বলতে হবে। চন্দন আর সৌরভীও যেতে চেয়েছিল, কিন্তু চন্দনকে যেতে দিলেও সৌরভীকে ছাড়া যায় না। ও বড্ড ছোট। আবার চন্দন গেলে সৌরভীও ছাড়বে না, তাই ওদের দুজনের কারোই যাওয়া হলো না।

জিপে করে শুভ্র আর অভ্র রওনা দিল। গরুমারা অভয়ারণ্যের ফরেস্ট অফিসার মিঃ শর্মা। তাঁর বাংলোতেই ওদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। মিঃ শর্মা, তাঁর স্ত্রী আর কাজের লোকজন ছাড়া বাংলোতে আর কেউ নেই। তাঁদের একমাত্র মেয়ে কলকাতায় দাদু দিদিমার কাছে থাকে, ওখানেই স্কুলে পড়ে। বাংলোর কাছেই বনরক্ষীদের ঘাঁটি। বন পাহারা দেওয়াই তাদের কাজ। এসব অঞ্চলে চোরাই শিকারীদের উৎপাত নাকি খুব। সুযোগ পেলেই প্রাণীহত্যা করে। গণ্ডারের খড়্গের ওপর এই শিকারীদের খুব লোভ, মোটা দাম পাওয়া যায়। তাছাড়া আশপাশ থেকে মানুষ এসে চুপিচুপি বনের গাছ কেটে নিয়ে যায়। এসব বন্ধ করার জন্যেই পাহারা। সবই ফরেস্ট অফিসারের দায়িত্ব।

মিঃ শর্মা ওদের অভয়ারণ্য ঘুরিয়ে দেখালেন। বাঘের দেখা না পেলেও নানান জাতের হরিণ ওদের চোখে পড়ল। আগে কখনও এমন বন দেখেনি দুই বন্ধু। বেশ কাটছিল দিনগুলি। বনে ঘুরে বেড়ানো আর নানারকম পাখির মাংসের ভোজন। মিঃ শর্মার বাবুর্চির রান্নার হাতটি কিন্তু খাসা।

ওরা যেদিন ওখান থেকে চলে যাবে তার দুদিন আগে রাত্রে সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছিল। মিঃ শর্মা খাবার ফাঁকে ফাঁকে মজার মজার গল্প বলছিলেন। এমন সময় বেয়ারা এসে বলল, বাইরে বনরক্ষীদের সর্দার অপেক্ষা করছে, বলছে জরুরী দরকার। মিঃ শর্মা খাওয়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। মিনিট কয়েক পরেই তিনি ফিরে এলেন। তাঁর চিন্তিত মুখ দেখে মিসেস শর্মা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন,'কি হয়েছে?'

'কাছেই একটা গ্রামে বুনো হাতির দল হানা দিয়েছে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে।' গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন মিঃ শর্মা।

'কেউ মরেনি তো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন মিসেস শর্মা।

'না, তেমন খবর নেই।'

'এই হাতিগুলো কি এখানকার বনের?' শুভ্র জিজ্ঞেস করল।

'বলা মুশকিল,' মিঃ শর্মা বললেন, 'গোটা উত্তর বাংলার বনে দুশ' আড়াইশ' কি তার সামান্য বেশি বুনো হাতি আছে। তাদের মধ্যে কিছু আবার 'গুণ্ডা'। আসলে এরা ক্ষ্যাপা হাতি, ডেঞ্জারাস। এদের সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই। যাকে সামনে পাবে পায়ে পিষে, শুঁড় দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, ঘর বাড়ি ভেঙে তছনছ করবে। তখন এদের গুলি করে মারা ছাড়া উপায় থাকে না।'

'যে বুনো হাতির দল এসেছে তাদের মধ্যে অমন গুণ্ডা হাতিও আছে নাকি?' অভ্র ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'তেমন কোনো খবর নেই,' মিঃ শর্মা জবাব দিলেন, 'তাছাড়া

গুণ্ডা হাতি সাধারণত দলছুট হয়ে এসে পড়ে।'

'কিন্তু আপনাদের এই বনেও তো বুনো হাতি আছে।' শুভ্র বলল।

বন পাহারা দেওয়াই তাদের কাজ।

'তা আছে,' মিঃ শর্মা জবাব দিলেন। 'তবে ভুটান আর আসামের বন থেকেও বুনো হাতির দল মাঝে মাঝে চলে আসে। তাই এখনও বোঝা যাচ্ছে না এরা এখানকার হাতি, না অন্য অঞ্চলের।'

'ওই গ্রাম থেকে ওদের এখন তাড়াবেন কেমন করে?' অভ্র জিজ্ঞেস করল।

'লোকজন নিয়ে টিন-ক্যানেস্তারা বাজিয়ে আর মশাল জ্বালিয়ে ওদের তাড়া করতে হবে,' মিঃ শর্মা বললেন, 'আগুনকে ওরা ভয় পায়। তাছাড়া হাতি খেদাবার এক্সপার্ট লোকও আছে। তেমন একজন হলো ভীম মাহাতো। লোকটার সাহস চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না। একা বুনো হাতির মুখোমুখি হতে ওর বুক কাঁপে না। হাতে মশাল নিয়ে একেবারে হাতির মুখোমুখি দাঁড়ায়, তারপর জ্বলন্ত মশাল দিয়ে হাতির কপালে আঘাত করে। দুর্দান্ত হাতিও তখন জঙ্গলে পালিয়ে যায়।'

'দারুণ সাহস তো!' অভ্র বলল, 'এমন মানুষকে সাহসের জন্য সরকার থেকে পুরস্কার দেওয়া উচিত।'

মিঃ শর্মা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, 'আমাকে এখুনি বেরুতে হবে, হাতির পালকে জঙ্গলে তাড়াতে না পারলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। ফসল নষ্ট হলে আশপাশের মানুষ আমাদের ওপর চড়াও হতে পারে, যেন হাতির অপকর্মের জন্য আমরাই দায়ী। ফরেস্ট অফিসার হয়ে এই হয়েছে জ্বালা!'

শুভ্রর আর অভ্রর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ওরাও তাঁর সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু মিঃ শর্মা রাজী হলেন না, বললেন, 'কিছু মনে করো না, তোমাদের কিছু হয়ে গেলে ডি. এম. আমাকে ক্ষমা করবেন না।'

একটা বন্দুক আর লোকজন নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। মিসেস শর্মার মধ্যে কিন্তু কোনো উদ্বেগ নেই। এরকম ঘটনা তাঁর গা-সওয়া হয়ে গেছে।

প্রায় ভোর রাতে মিঃ শর্মা ফিরলেন। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। শুভ্ররা তাঁর জিপের শব্দ শুনেই উঠে এসেছিল। হাতির দলকে নাকি অনেক কষ্টে তাড়ানো গেছে, জঙ্গলের দিকেই খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সকালে চায়ের টেবিলে হাতির সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য মিঃ শর্মার মুখে ওরা জানতে পারলো। একটা বড় হাতির দৈনিক খাবার হচ্ছে প্রায় ৩০০ কিলো কচি গাছ-পাতা, আর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দরকার কম করেও ১০০ লিটার জল। তাছাড়া দিনের বিশ্রামের জন্য চাই ছায়াঘেরা জায়গা। হাতির মতো প্রকাণ্ড প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট বনাঞ্চল, সবুজ ঘাসপাতা আর প্রচুর পানীয় জল দরকার নইলে ডাইনোসরের মতো হাতির অস্তিত্বও একদিন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে। এ কথা চিন্তা করেই ভারত সরকার হাতিকে ১৯৭২-এর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে বিশেষ সংরক্ষিত প্রাণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

বনে খাবার অভাব হলে কিংবা মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যেও হাতির দল লোকালয়ে এসে ক্ষেতের ফসল খেয়ে শেষ করে। তবে যে হাতির দল এবার এসেছিল, তারা সংরক্ষিত বনের প্রাণী নয় বলেই মিঃ শর্মার ধারণা।

সেদিন আর হাতির উপদ্রবের কথা শোনা গেল না। কিন্তু

পরদিন সকালেই আরেকটা খবর এল।

[তিন]

মিঃ শর্মা সকালের রাউন্ড সেরে সবে বাংলোয় ফিরে অফিসের কাগজ-পত্তর নিয়ে বসেছেন, এমন সময় একজন বনরক্ষী এসে খবর দিল মূর্তি বিটের ভোকলমারডি বনে একটা হাতি মরে পড়ে আছে, তার দাঁত দুটো কেটে নিয়ে গেছে কারা। খবরটা শুনেই মিঃ শর্মা লাফিয়ে উঠলেন। তখুনি বেরুবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শুভ্র আর অভ্র জানতে চাইল কি ব্যাপার। পোশাক বদলাতে বদলাতে মিঃ শর্মা বললেন, 'আর বলো না, চোরাই শিকারীর উপদ্রবে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। গণ্ডারের শিং আর হরিণের চামড়ার জন্য এরা জঙ্গলের মধ্যে ওৎ পেতে থাকে। সুযোগ পেলেই মারে। হাতি মারার ঘটনা কিন্তু এতদিন তেমন ঘটেনি। মনে হচ্ছে কাল রাতের অন্ধকারে হাতিটাকে মেরে দাঁত দুটো ওরা কেটে নিয়ে গেছে।'

'যে হাতির দলকে পরশু রাতে আপনারা বনের দিকে তাড়িয়ে ছিলেন, তাদেরই একটাকে কি মেরেছে?' অভ্র জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে।' মিঃ শর্মা জবাব দিলেন।

'হাতির দল এই শিকারীদের আক্রমণ করে না?' শুভ্র জিজ্ঞেস করল।

'চোরাই শিকারীরা খুব সাবধানী, লুকিয়ে থেকে গুলি করে। তাছাড়া গুলির শব্দে হাতি ভয় পায়। আসলে,' বন্দুকে টোটা ভরতে ভরতে মিঃ শর্মা বললেন, 'দু'রকম চোরাই শিকারী আছে। এক রকম শিকারীর লক্ষ্য হলো অ্যাডভেঞ্চার আর অন্যদের এটা হলো পেশা। একটা গণ্ডারের শিংয়ের দাম বাজারে অনেক, বিদেশেও খুব চাহিদা। এই হাতিটা যদি পূর্ণবয়স্ক হয় তবে ওটার দাঁত দুটোর ওজন হবে ৮০ থেকে ১০০ কেজি। ওই দাঁতের এখনকার বাজার দর হলো প্রায় চার হাজার টাকা কেজি।'

'উরে ব্বাস!' অভ্র বলল, 'তার মানে আশি কেজি ধরলেও এইট্টি ইন্টু ফোর থাউজেন্ড ইকোয়ালটু থ্রি লাখস টুয়েনটি থাউজেন্ড। একটা দাঁতাল হাতি মারতে পারলেই শিকারী চোরদের পোয়াবারো।'

'আপনার তো পাহারা দেবার লোকজন রয়েছে,' শুভ্র বলল, 'তারা কি করে?'

'এত বড় জঙ্গল সেই তুলনায় বনরক্ষীর সংখ্যা সামান্যই', মিঃ শর্মা বললেন, 'গোটা বন টহল দেওয়া সম্ভব নয়।'

শুভ্রদের সেদিনই ওখান থেকে চলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু এই ঘটনায় মিঃ শর্মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সেদিন যাওয়া হলো না। মিঃ শর্মা বললেন, যেখানে হাতিটা পড়ে আছে সেখানে প্রথমে যাবেন। ওটার মৃতদেহের একটা ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর থানায় খবর দেওয়া আছে। চোরাই শিকারীরা হয়তো এখনও কাছাকাছিই আছে, তাদের ধরবার চেষ্টা করতে হবে। শুভ্র আর অভ্র সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, ওদের মনে একটা অ্যাডভেঞ্চারের পুলক জেগে উঠেছে। কিন্তু এবারও মিঃ শর্মা রাজী হলেন না। উনি কখন ফিরবেন ঠিক নেই। তাঁর এখন অনেক কাজ, বন দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে।

মিঃ শর্মা চলে যেতেই শুভ্র আর অভ্র বেরিয়ে পড়ল। মিসেস শর্মা অবিশ্যি বার বার ওদের বলে দিলেন বেশি দূর যেন না যায়। বনের গভীরে যে বুনো হাতি ছাড়াও বাঘের মতো হিংস্র প্রাণী আছে সে কথাও তিনি মনে করিয়ে দিলেন।

ওরা বনের কাছাকাছি একটু ঘুরে বেড়াবে বলেই বেরুলো। গভীর বনে খালি হাতে ঢোকা যে বোকামি তা বোঝবার মতো বয়স ওদের হয়েছে। একবার ওদের মনে হয়েছিল দুটো বন্দুক সঙ্গে করে আনে। ফরেস্ট অফিসারদের বাড়িতে বন্দুক গোটা দু-তিনেক থাকেই। কিন্তু মিসেস শর্মা যদি অন্য কিছু মনে করেন এই ভেবে ওরা আর বন্দুকের কথা তোলেনি।

[চার]

বনের গা ঘেঁষে ওরা হাঁটছিল। বেলা বেশি হয়নি। শুভ্র বলল, 'চল একটু ভেতরে যাই, সেদিন মিঃ শর্মা কত রকম পাখি দেখিয়েছিলেন, আজও দেখা পেতে পারি।'

অভ্র আপত্তি করল না।

ওরা বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। গাছে গাছে কত রকম পাখি। কয়েকটা রঙচঙে ল্যাজঝোলা পাখি ওদের চোখে পড়ল। ওদের হাত নিশপিশ করছিল। একটা বন্দুক যদি সঙ্গে থাকত!

কিন্তু এই বন সংরক্ষিত, এখানে প্রাণীহত্যা করা অপরাধ। একদিক দিয়ে ভালোই, মানুষের অকারণ নিষ্ঠুর হত্যালীলায় বনের জীব-জন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে, আবার বন কেটে সাফ করার ফলে জীব-জন্তুর বিচরণভূমি ক্ষীণ হয়ে আসছে, কমে আসছে বনজ খাদ্য আর সেই সঙ্গে বন্য প্রাণীর আয়ু। বন কেটে বসত গড়ে উঠছে তার ফলে শুধু জীব-জন্তুরই সর্বনাশ হচ্ছে না, নষ্ট হচ্ছে বন্য পরিবেশ। বনের আস্তরণ ছাড়া বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে যায়, সমতলভূমিতে নেমে আসে বন্যা, আবার বনের অভাবে দেখা দেয় অনাবৃষ্টি আর খরা।

শুভ্রদের অবিশ্যি এত বিচার বুদ্ধি এখনও হয়নি। ওদের কিশোর বয়স, মনে লেগেছে অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়া, ক্রমেই যে বনের গভীরে ঢুকে পড়ছে সে হুঁশ ওদের ছিল না। এক জায়গায় একটা পুকুরের মতো, তার চারপাশে কত পাখি, কয়েকটা হরিণও দেখা গেল। কচি সবুজ ঘাস চিবোচ্ছিল। ওদের পায়ের শব্দে

মিঃ শর্মা বেরিয়ে পড়লেন।

মুখ তুলে তাকালো। চিড়িয়াখানার হরিণ আর মুক্ত বনের হরিণ, এ দুয়ে যেন তুলনা হয় না।

বনের মধ্যে বড় বড় ঘন গাছ, সূর্য সব জায়গায় গাছ ভেদ করে মাটি স্পর্শ করেনি, দিনের বেলাতেও তাই অন্ধকার অন্ধকার। শুভ্র হঠাৎ হাতঘড়ি দেখে বলল, 'আরে! একটা বাজে, শীগগির ফিরে চল, মিসেস শর্মা চিন্তা করবেন।'

ওরা ফিরে চলল। প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পরেও বনের সীমানার ধারে কাছে ওরা পৌঁছতে পারল না। তখনই বুঝতে পারল ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছে, ঢুকে পড়েছে বনের অনেক গভীরে। ওদের বুকের ভেতর কেমন যেন করতে লাগল, নিরস্ত্র অবস্থায় এই বনে ঢোকা উচিত হয়নি। তাছাড়া সঙ্গে এমন কাউকে আনা উচিত ছিল যে বনের আটঘাট জানে। এখন উপায়! আশে-পাশে মানুষের সাড়া নেই। শুভ্র বলল, 'আয় আমরা টার্জানের মতো দু'হাতে মুখ ঢেকে আ-আ শব্দ করি। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ শুনতে পাবে।'

অভ্র বলল, 'না, এখনও পর্যন্ত বনের কোনো হিংস্র প্রাণী টের পায়নি আমরা এখানে আছি। চেঁচিয়ে ওদের জানিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। বুনো হাতির দল হয়তো কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

শুভ্র ওর যুক্তি ফেলতে পারল না।

আবার নতুন উদ্যমে দুই বন্ধু হাঁটা শুরু করল। কিন্তু ওরা যেন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়েছে, কিছুতেই বেরুতে পারছে না। এদিকে বেলা পড়ে আসছে। হতাশা আর ভয় দুটোই পাথরের মতো বুকে চেপে বসল ওদের। সন্ধ্যে নেমে আসবে, তারপর আসবে রাত। সারা রাত এই বনে কাটাতে হলে আর রক্ষে নেই, হয়তো আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না।

হঠাৎ ওরা মানুষের গলা শুনতে পেল। ভীষণ আনন্দ হলো দুজনের। যাক ভগবান ওদের রক্ষা করেছেন। গলার স্বর লক্ষ্য করে ওরা হাঁটতে লাগল। খানিকটা গিয়ে ওদের চোখে পড়ল এক জায়গায় বেশ কিছু ঝোপ, প্রায় বুক সমান উঁচু। তার ভেতর থেকেই মানুষের গলা আসছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওরা অবাকই হলো। ব্যাপার কি! একটু সাবধান হয়ে গেল ওরা। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওই ঝোপের দিকে এগোলো। কাছেই একটা মস্ত গাছ। তার মোটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে পেল চারজন লোক বসে বসে কথা বলছে। গলা না পেলে ওদের অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যেত না।

সবারই মাথায় শোলার টুপি, গায়ে শিকারীর পোশাক, দুজনের হাতে বন্দুক। চারজনের মধ্যে একজন সাহেব। ওরা হিন্দি ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলছিল। কালো মতন একজন বলল, 'আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না সাহেব, এখানকার ফরেস্ট অফিসার সুবিধের নয়। হাতির খবর এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছে, টহল জোরদার করবে। অবিশ্যি হাতিটা মারা পড়েছে এখান থেকে অনেক দূরে। সেখানেই জোর টহল হবে।'

'কিন্তু আমার একটা গণ্ডারের শিঙ যে চাই,' সাহেব বলল। 'আমি খুব ভাল দাম পেয়েছি, তোমাদের খুশিই করে দেব।'

'না সাহেব,' কালো লোকটি বলল, 'হাতির দাঁত নিয়েই এবার বিদেয় হও, আজ রাতেই এখান থেকে আমরা সরে পড়ব। প্রত্যেকটি মিনিট এখন বিপজ্জনক। ফরেস্ট অফিসারের লোকজন ছাড়াও পুলিশও হয়তো রাস্তার ওপর নজর রেখেছে। বেশি লোভ করতে গিয়ে শেষে ধরা পড়ে যাব। ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল, শুধু তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্য আমরা নিজেদের বিপদ ডেকে আনছি।'

'অল রাইট,' সাহেব বলল, 'তোমরা যখন ভয় পাচ্ছ....'

'ভয়!' এবার বলে উঠল ষণ্ডামার্কা একজন, 'ভয় থাকলে এসব কাজে নামতাম না সাহেব। রাত্রে বনের মধ্যে প্রাণ হাতের মুঠোয় করে আমাদের চলাফেরা করতে হয়। বাঘের সামনে কখনও পড়েছ? এই দ্যাখ।' জামাটা সে খুলে ফেলল। দেখা গেল কাঁধের কাছে একটা বিশ্রী শুকনো ক্ষত। 'বাঘের থাবা', লোকটি বলল, 'তুমি তো মাল নিয়ে খালাস, সব বিপদ আমাদের ওপর দিয়ে যায়। একদিকে বনের হিংস্র জানোয়ার, অন্যদিকে বনের পাহারাদার আর পুলিশ। ভয়ের কথা তুমি বলছ!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' সাহেব বলল, 'দাঁত দুটোকে গাড়িতে তুলে দাও।' তারপরই একটু হেসে বলল, 'তোমাদের পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও লুকনো জায়গা থেকে ও দুটোর খোঁজ পাবে না।'

শুভ্র আর অভ্রের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এরাই হচ্ছে চোরাই শিকারী, গতকাল রাত্রে হাতিটাকে মেরেছে। ওই সাহেব হলো খদ্দের। হাতির দাঁত ছাড়াও একটা গণ্ডারের শিঙ তার দরকার তাই এখনও পর্যন্ত বনের ভেতর ঘাপটি মেরে আছে। কি দুঃসাহসী লোকগুলো!

'বিক্রম', কালো মতন লোকটি এবার ষণ্ডামার্কা লোকটাকে বলল, 'চল, ওগুলো গাড়িতে তুলে ফেলি। সাহেব, তোমাকেও হাত লাগাতে হবে, ভারি তো কম নয়।'

'ও কে', সাহেব বলল।

ঠিক তখুনি একটা মশা ঢুকে গেল অভ্রর নাকে আর ও হেঁচে ফেলল।

'কে? কে?' লাফিয়ে উঠল চোরাই শিকারীর দল। তারপরই দেখে ফেলল ওদের দুজনকে। কোথায় বা পালাবে ওরা! ওদের কাবু করে ফেলতে একটুও কষ্ট হলো না দুষ্টু মানুষগুলোর।

'কে তোমরা?' কালো লোকটা লাল লাল চোখে বলল, 'এখানে কি করছ?'

'আমরা বনে পথ হারিয়ে ফেলেছি।' শুভ্র জবাব দিল। ও ভেবে দেখল এখন ভয় পেলে চলবে না।

'পথ হারিয়ে ফেলেছ?' কালো লোকটির ভুরু কুঁচকে গেল। 'বনের মধ্যে এসেছিলে কেন?'

'বেড়াতে', শুভ্র বলল, 'আমরা দুই বন্ধু কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। বনের ভেতর ঘুরছিলাম তারপর আর ফিরে যাবার পথ খুঁজে পাইনি। সেই সকাল থেকে আমরা বেরুবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ আপনাদের গলা শুনে ভাবলাম এবার সাহায্য পাওয়া যাবে।'

'তা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলে কেন?' কালো লোকটির সন্দেহ তবু যায় না।

কার বাড়িতে এসেছ তোমরা?' এবার প্রশ্ন করল যার নাম বিক্রম।

'ওই যে ফরেস্ট অফিসার মিঃ শর্মা, তাঁর বাড়িতে,' অভ্র একটু তাড়াতাড়িই জবাব দিল। ওর বোধহয় মনে হলো শুভ্র একাই কেন সব কথার জবাব দেবে।

শুভ্র কটমট করে তাকালো অভ্রর দিকে। ফরেস্ট অফিসারের নাম বলা উচিত হয়নি। সে অন্য কোনো একটা নাম বানিয়ে বলত লোকগুলোকে। এ অঞ্চলের সবাইকে এরা চেনে নাকি!

'ফরেস্ট অফিসারের বাড়িতে!' কালো মানুষটির গলা তীক্ষ্ণ শোনালো। 'গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলে, সবই জেনে গেছ। ভালই হলো, ফরেস্ট অফিসারকে অনেকদিন ধরে শিক্ষা দেবার ইচ্ছে ছিল। দু'বছর আগে আমাকে খুব হেনস্থা করেছিল। এবার বাগে পেয়েছি।'

'ওদের নিয়ে কি করবে বেঞ্জি?' সাহেব জিজ্ঞেস করল।

'এদের ছাড়া যাবে না, সব খবর দিয়ে দেবে। তবে প্রাণে মারব না', কালো লোকটি হেসে উঠল, 'হাত-মুখ বেঁধে এখানে ফেলে রেখে যাব। দু'চারদিনের মধ্যে কেউ খুঁজে পাবে এমন ভরসা কম। বুনো হাতির পায়ের তলায় কিংবা বাঘের মুখে ওরা যদি না পড়ে তবে ওদের ভাগ্য খুব ভাল বলতে হবে।' তারপরই চতুর্থ লোকটিকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'ওমর।'

লোকটি উঠে দাঁড়ালো। গায়ের রঙ তামাটে, চাবুকের মতো চেহারা। নিপুণ হাতে সে ওদের মুখ, হাত-পা বেঁধে ফেলল। ওদের মাটিতে ফেলে রেখে ওরা চলে যাবার জন্য গোছাতে শুরু করল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গোছানো শেষ হলে কয়েকটা টিনের মুখ কেটে ওরা খাওয়া শুরু করল। শুভ্ররা বুঝল টিনের খাবার। ওরা বেশ তৈরি হয়েই বনে এসেছে। খাদ্য পানীয় সব কিছুই সঙ্গে আছে। শুভ্রদেরও খুব খিদে পেয়েছিল। সেই সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছে, সারাদিন খাওয়া হয়নি, তার ওপর হাঁটাহাঁটি, পরিশ্রমও কম হয়নি। ছোট্ট একটা স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে ওরা খাওয়া সারছিল, সঙ্গে বড় বড় টর্চও আছে, হান্টিং টর্চ।

গাড়িটা বোধহয় কিছু দূরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, হয়তো এখানে গাড়ি ঢোকানো সম্ভবও ছিল না। খাওয়া শেষ করে

দু'বছর আগে ধরা পড়েছিল।

সব কিছু হাতে হাতে ওরা বয়ে নিয়ে গেল। চলে যাবার সময় ওদের 'টা-টা' করে গেল।

ওরা দুজন মাটিতে পাশাপাশি শুয়ে আছে, কথা বলতে পারছে না, নড়া-চড়াও করতে পারছে না। দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখ আর দু'পাও বাঁধা। নিঃসীম অন্ধকার। শুরু হলো মশার কামড় আর কত রকম শব্দ। রাত-জাগা পাখি আর জানোয়ারের ডাক। রক্ত হিম হয়ে যায়। ওদের দুজনেরই চোখ দিয়ে নেমে এল জলের ধারা। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসে বেঘোরে প্রাণটা যেতে বসেছে। কি দরকার ছিল একা একা বনে ঢোকবার! এতক্ষণে মিঃ শর্মা নিশ্চয়ই লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন, কিন্তু এত বড় বনের কোথায় তিনি খুঁজবেন ওদের!

ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল রাতের অরণ্যের বিভীষিকা। একসময় ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না, হঠাৎ একটা বিচিত্র অনুভূতিতে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। বনের এই জায়গাটা একটু ফাঁকা, চাঁদের আলো যেন লুকোচুরি খেলছে। সেই আলোয় ওরা যা দেখল তাতে ওদের মূর্ছা যাবারই কথা, কিন্তু আশ্চর্য, ওরা জ্ঞান হারালো না। কালো কালো দুটো বিরাট মূর্তি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সাক্ষাৎ যমদূত। ঐরাবতের মতো দুটো হাতি। ওদের শুঁড় থেকে ঝোড়ো নিশ্বাস এসে পড়ছে দুই বন্ধুর মুখে, তাই ভেঙে গিয়েছে ঘুম। ওরা অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল। সব বোধশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে। আর কোনো আশা নেই। এখুনি হয়তো হাতি দুটো পায়ে পিষে ওদের চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে ফেলবে, নয়তো শুঁড় দিয়ে শূন্যে তুলে আছাড় মারবে।

আশ্চর্য! হাতি দুটো একটু সরে গেল। মাথা নিচু করে খুব কাছাকাছি এনে কিছু যেন পরামর্শ করল। তারপর আবার ফিরে এল হস্তী যুগল। শুঁড় বাড়িয়ে দিল ওদের দিকে। শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে শূন্যে তুলে নিল ওদের। এবার নিশ্চয়ই আছাড় মারবে। ওরা দু'চোখ বুঁজে ফেলল।

কিন্তু কই, ওদের তো আছাড় মারছে না! ওরা ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল। হাতি দুটো ওদের শুঁড়ে জড়িয়ে হেঁটে চলেছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদের!

প্রতিটি মুহূর্ত ওদের মনে হতে লাগল যেন এক যুগ। তারপর একসময় হাতি দুটো থমকে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে ওদের শুইয়ে দিল। ওরা বুঝতে পারল জায়গাটা বনের ভেতর নয়। কারণ দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। হাতি দুটো ওদের রেখে আবার ফিরে গেল বনে। ওরা বিশ্বাসই করতে পারছে না দুটো বুনো হাতি ওদের প্রাণ বাঁচালো। গভীর বনে ওদের অমন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অনুভূতি দিয়ে বুঝেছিল ওরা বিপদে পড়েছে তাই বনের বাইরে রেখে গেল। একি স্বপ্ন না সত্যি!

ভোরবেলা একজন বনকর্মী ওদের দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পাঠালো ফরেস্ট অফিসারের কাছে। গতকালই সব বনরক্ষী ও আশপাশের মানুষকে ওদের সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়েছিলেন মিঃ শর্মা। সারা রাত তিনি ঘুমোননি, শুধু ছোটাছুটি করেছেন।

[পাঁচ]

মিঃ শর্মা ওদের খুব বকলেন, বললেন, 'এমন করে বনের মধ্যে গিয়ে তোমরা খুব অন্যায় করেছ। বনে পথ হারিয়ে এই এক বছর আগেই একজন বাঘের হাতে মারা পড়েছিল। তোমাদের কিছু হলে ডি. এম. আমাকে ক্ষমা করতেন না।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'ভাগ্যিস রাম-লক্ষ্মণ তোমাদের দেখতে পেয়েছিল, নইলে কি যে হতো তোমাদের ভগবানই জানেন!'

'রাম-লক্ষ্মণ!' ওরা দু'জনে অবাক হয়ে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, যে হাতি দুটো তোমাদের বাঁচিয়েছে তারা রাম-লক্ষ্মণ না হয়ে যায় না। খুব ভাল ওরা, মানুষের কোনো ক্ষতি করে না, বরং উপকারই করে। একবার একটা বাচ্চা মেয়ে বনের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল, তাকেও ওরা বনের বাইরে রেখে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে আমাদের বাংলোয় এসে হাজির হয়। আমরা খেতে দিই, আবার ফিরে যায়।'

তিনি ওদের মুখ থেকে পুরো ঘটনা আবার শুনলেন, তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'বেঞ্জি! বুঝেছি, বেঞ্জামিন। দু'বছর আগে জঙ্গলে ধরা পড়েছিল, তবে সেবার কিছু মারতে পারেনি। অনুমতি ছাড়াই বন্দুক নিয়ে অভয়ারণ্যে ঢোকবার অপরাধে আমি ওকে গ্রেপ্তার করেছিলাম। ওর পক্ষে দাঁড়িয়েছিল কলকাতার এক বাঘা উকিল, তিনিই কেসটা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটা ডেঞ্জারাস, হাতের নিশানাও শুনেছি দারুণ। আদালতের মধ্যেই আমাকে শাসিয়েছিল, দেখে নেবে। বিক্রম ওর শাগরেদ। প্রমাণের অভাবে এতদিন ওদের শাস্তি হয়নি, কিন্তু এবার আমি ছাড়ব না। ওদের ডেরা যে শিলিগুড়িতে তা আমি জানি, ওখানকার পুলিশও জানে।'

তিনি তক্ষুণি লোকাল থানায় ফোন করলেন, নিজেও দু'জন বনরক্ষী নিয়ে জিপে উঠলেন। এবার কিন্তু শুভ্র আর অভ্রকে তিনি সঙ্গে নিলেন, ওই লোকদের সনাক্ত করার জন্য ওদের দরকার হবে। প্রথমে তিনি থানায় গেলেন। থানায় ও.সি. সশস্ত্র কনস্টেবল নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি জানালেন শিলিগুড়ি পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে ওরা পালাতে না পারে। শুভ্র মিঃ শর্মাকে বলল, কথাবার্তার সময় ওই সাহেব একবার এভারেস্ট হোটেলের নাম করেছিল। খুব সম্ভব, সে

ওখানেই আছে। সেই হোটেলেও নজর রাখবার জন্য শিলিগুড়ির পুলিশকে অনুরোধ করলেন মিঃ শর্মা।

শিলিগুড়ি পৌঁছে মিঃ শর্মা আর ও.সি. ওখানকার পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। জলপাইগুড়িতে ডি.এম.কে সব জানানো হয়েছে, তিনি পুলিশকে সব রকম সাহায্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও এসে পড়বেন যে কোনো মুহূর্তে। ছোটখাট একটা পুলিশবাহিনীই তৈরি হয়ে গেল।

বাজারের কাছে ঘিঞ্জি এলাকায় একটা বাড়ি ঘিরে ফেলল পুলিশ। মিঃ শর্মা শুভ্রদের নিয়ে সদর দরজায় ধাক্কা মারলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ওখানকার পুলিশ অফিসার আর দু'জন সেপাই। সবাই সশস্ত্র। দরজা খুলতেই মিঃ শর্মা সদলবলে ঢুকে পড়লেন।

ভেতরের একটা ঘরে বেঞ্জামিন, বিক্রম আরও কয়েকজন তাস খেলছিল। তাদের সামনে নানারকম মুখরোচক খাবার। মিঃ শর্মা আর পুলিশকে দেখে ওরা লাফিয়ে উঠল, কিন্তু প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পেল না। পুলিশ সবাইকে গ্রেপ্তার করল। শুভ্র আর অভ্রকে দেখে দু'চোখ জ্বলে উঠল বেঞ্জামিনের, বলল, 'বুঝেছি, তোমরাই এসবের মূলে। আমার খুব ভুল হয়েছে, তোমাদের শেষ করে ফেলাই উচিত ছিল।'

ওদের কাছে প্রচুর টাকা পাওয়া গেল। জেরার মুখে ওদের একজন স্বীকার করল ওই সাহেব এভারেস্ট হোটেলেই আছে তবে আজই চলে যাবার কথা। হাতির দাঁত তার কাছেই আছে।

ওই হোটেলের ওপর পুলিশ আগেই নজর রেখেছিল। সাহেব জিনিসপত্তর নিয়ে গাড়িতে উঠেছে এমন সময় তাকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। মিঃ শর্মা আর শুভ্ররাও সেই সময় এসে পড়ল, আর এলেন শুভ্রর পিসেমশাই, জলপাইগুড়ির জেলাশাসক। সাহেব খুব তর্জন গর্জন করলেও কিন্তু পুলিশ তার কথায় কান দিল না। থানায় নিয়ে যাওয়া হলো তাকে।

গাড়িটা বিদেশী, বিশেষ ভাবে তৈরি, অনেক লুকনো জায়গা আছে যা বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। শুভ্ররা সাহেবের মুখে এ কথা শুনেছিল, মিঃ শর্মাকে তা বলেও ছিল। তাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে গাড়িটা পরীক্ষা করা হলো। বেরিয়ে পড়ল পা-দানির তলায় একটা লুকোবার জায়াগা। সেখানেই পাওয়া গেল হাতির দাঁত। সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হলো।

শুভ্রদের নিয়ে ওদের পিসেমশাই জলপাইগুড়ি ফিরে গেলেন। খুব বকাবকি করলেন দুইজনকে। বললেন, 'তোমরা কলকাতার ছেলে নিজেদের খুব বাহাদুর মনে কর। ওই গভীর জঙ্গলে একা একা ঢুকেছিলে কোন আক্কেলে? তোমাদের কিছু হলে আমার কি অবস্থা হতো ভেবে দেখেছ? তোমাদের মা-বাবার কাছে কোনোদিনই আমি মুখ দেখাতে পারতাম না। ভগবানের অসীম করুণা যে তোমরা বেঁচে ফিরেছ। কালই তোমাদের কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করছি।'

'জলদাপাড়া অভয়ারণ্য দেখাবেন বলেছিলেন,' শুভ্র একটু মাথা চুলকে বলল।

'জলদাপাড়া!' পিসেমশাই গর্জন করে উঠলেন, 'বাঘ যে তোমাদের গলদা চিংড়ি করে খায়নি এই তোমাদের ভাগ্যি।'

চন্দন আর সৌরভী বাবার কথা শুনে হেসে উঠল।

'আহা, ওদের অমন বকছ কেন?' পিসিমা বললেন, 'বেচারাদের ওপর দিয়ে কি ধকলই না গেল!'

শেষ পর্যন্ত পিসেমশাই ওদের ভুটান ঘুরিয়ে আনবেন কথা দিলেন। তবে আর একলা ছাড়বেন না, সবাই মিলে যাবেন।

কলকাতায় ফিরে আসার পর শুভ্র আর অভ্র বনদপ্তর থেকে একটা চিঠি পেল। লিখেছেন বন দপ্তরের সচিব। চোরাই শিকারীদের ধরবার ব্যাপারে ওরা যে সাহস দেখিয়েছে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তিনি। যারা ধরা পড়েছে তারা কুখ্যাত শিকারী, অনেকদিন ধরেই বনবিভাগের নজর এড়িয়ে প্রাণীহত্যা করছিল। শুধু উত্তরবঙ্গই নয়, ওড়িশা, আসাম, অরুণাচল, মেঘালয় এসব রাজ্যেও এদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি আছে। শুভ্রদের সাহসিকতার পুরস্কার হিসাবে রাজ্য সরকার ওদের এক হাজার করে টাকা আর সরকারি খরচে উত্তরপ্রদেশের করবেট ন্যাশনাল পার্ক ঘুরিয়ে আনবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ওদের আর আনন্দ ধরে না। বিখ্যাত শিকারী জিম করবেটের স্মৃতি বিজড়িত ওই পার্ক দেখার ইচ্ছে ওদের অনেকদিনের। সে সাধ এবার পূর্ণ হতে চলেছে।

ছবিঃ ধ্রুব রায়

ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত আপনার
সরল অভিধান
(সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিশোধিত এবং পরিবর্ধিত)
সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে
দেব সাহিত্যের অনবদ্য সংকলন
অরুণ দের
হাসির হুল্লোড়
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
দুরন্ত এক অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী
সাহারার সন্ত্রাস
দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

তিতলির যাদু-পুতুল

- পল্লব পৃততুন্ড
- দোলা পৃততুন্ড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অশিক্ষিত পাহাড়ী উপজাতিদের মধ্যে বহু কুসংস্কার আছে। কিন্তু ওরা বিশ্বাসের সঙ্গে এগুলো করে- ভাঁওতা দেবার জন্য নয়। ওরা মিথ্যে বলেনা। একশো বছর বয়স্ক ঝকঝকে পুতুলটা সম্পর্কে কৌতূহলী হলাম।

পুতুলটার ইতিহাস সম্পর্কে আরও কিছু বলো সর্দার!

আমার এক পূর্বপুরুষ শুভ আত্মার উপাসনা করতেন। যেমন 'ভুডু'-রা করে অশুভ ক্ষতিকারক আত্মার

আমার প্রপিতামহের ঠাকুর্দা তাঁর বড় ছেলেকে এটি দেন...

এটাকে বংশানুক্রমে সযত্নে রক্ষা করবে। যেদিন সম্পূর্ণ সৎ, নির্লোভ, সুকুমার কোনও মালিকের হাতে এটি পড়বে, তৎক্ষনাৎ এর যাদু ক্ষমতা প্রকাশ পাবে।

!

গত চারপুরুষে এর কোনও যাদু ক্ষমতার প্রকাশ আমরা দেখিনি। হয়তো সর্দারের দায়িত্বে থেকে একশোভাগ সুকুমার থাকা সম্ভব হয়না বলেই। এর মর্যাদা রক্ষা কোর বন্ধু!

নিশ্চয়ই- সর্দার!

আশ্চর্য গল্প! এসব তুমি বিশ্বাস করো?

প্রশ্নটা তোমার- আমার বিশ্বাসের নয় বৌদি! আদিবাসী বন্ধুর উপহার আমি মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। আর—

-দিয়েছি এমন একজনকে যে আমার চাইতে বেশি মর্যাদার সঙ্গে ওকে রক্ষা করবে!

গোম্বোকে আমার খুব ভাল লেগেছে কাকাসোনা!

গভীর রাত… উৎসবের হট্টগোল থেমে গেছে…
ঘুমোও গোম্বো! কাল সকালে আমরা খেলা করবো!
সবাই গভীর ঘুমে অচেতন… কিন্তু একটা মৃদু শব্দ একজনের একশো বছরের ঘুম ভাঙাল…
নিচের তলায় লোক ঢুকেছে মনে হচ্ছে! এতো রাতে— নিশ্চয়ই বদমায়েশ লোক!
বিছানার চাদরটা ধরে নামি!
দরজা বন্ধ! জানালা দিয়ে বেরোই! জলের পাইপটা যথেষ্ট সরু!
সম্ভবতঃ নিচতলায় তিতলিদের মনিহারি দোকান থেকেই আওয়াজটা এসেছে! প্রথমে ওদিকটা দেখি!
মনিহারি দোকানের স্টোর-রুমে ডাঁই করে রাখা পেটির আড়ালে আশ্রয় নেয় গোম্বো…
এই পেটিগুলোই আজ চালান এসেছে! দামী বাইরের মালে ভর্তি! দারুণ দাঁও!
দেরি না করে সরিয়ে ফেলি তাড়াতাড়ি!
একরত্তি গোম্বো কি পারবে দৈত্যগুলোকে আটকাতে? নাকি চোরেরাই সফল হলো? পরের সংখ্যায় দেখ—
যা ভেবেছি, তিতলিদের সর্বস্বান্ত করার তাল করছে চোরগুলো! ওদের আটকাতেই হবে!

[চলবে]

অরণ্যপতি টারজান

সব্যসাচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হেঁটে হেঁটে পথের শেষে যখন গিয়ে পৌঁছল টারজান, তখন রাত আটটা বেজে গিয়েছে। ছোট শহর, লোক কম। টারজান হঠাৎ সে শহরে ঢুকলো না। তার খেয়াল আছে যে তার বেশভূষা শহরবাসী আফ্রিকানদের বিস্ময়ের উদ্রেক করবে, তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে সবাই। শ্বেতাঙ্গ যারা, তারা থাকে সেনানিবাসে, টারজানকে দেখলেই সন্দেহ করবে তারাও, অনেকে হয়তো লর্ড গ্রেস্টোকের আকৃতি-প্রকৃতির বিররণ শুনেছেও ইতিপূর্বে। এই জংলী লোকটাই যে গ্রেস্টোক, এটা বুঝতে পারলে তক্ষুণি তারা বন্দী করবে তাকে। উভয় সংকট, না?

কী করবে তাহলে টারজান এখন? বনে-অরণ্যে যার গতিবিধি অবাধ, যে কোনো সংকটে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে যার তিলমাত্র বিলম্ব হয় না, লোকালয়ের কাছাকাছি পৌঁছেই সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সন্তর্পণে ঘোরাঘুরি করতে লাগল শহরতলিতে, দূরে পদশব্দ শোনা গেলেই লুকিয়ে পড়তে লাগল ঝোপেঝাড়ে বা কোনো ভাঙা ঘরে।

টহলদার সৈন্য এদিক ওদিক ঘুরছে পথে পথে। সশস্ত্র সান্ত্রী ঐ তো একজন, টারজানের থেকে একশো গজের মধ্যেই। যুদ্ধের হাওয়া এখানেও উদ্দাম বেগে বইছে। সে যা হোক, ঐ যে নিঃসঙ্গ সান্ত্রীটা, ওর চোখ এড়িয়ে শহরের ভিতরে ঢোকা টারজানের পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু এই নিরাবরণ দেহ নিয়ে পথে পথে ঘোরা বা বাড়িতে বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেড়ানো তো একেবারেই অসম্ভব! অথচ ঘোরাফেরা না করলে মুয়েরবার্নকের পাত্তা পাওয়া যাবে কেমন করে?

একটুখানি চিন্তা করেই কর্তব্য স্থির করে ফেললো টারজান। ঢুকতে তাকে হবেই শহরে। আড়াল থেকে আড়ালে আত্মগোপন করে করে। যেখানে ঝোপঝাড় নেই, ভাঙা কুঁড়ে বা খড়ের পাঁজা নেই, সেখানে মাটিতে সটান হয়ে শুয়ে পড়ে, কানে হেঁটে হেঁটে। এইভাবে, অপরিসীম মেহনতে টারজান অবশেষে একসময় একটা গোয়ালঘর-জাতীয় কুঁড়েতে গিয়ে উঠল, একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য। এর পরেই সারি সারি বসতবাড়ি, বিত্তবান লোকদেরই বাড়ি বোধহয়। সেই সব বাড়ির পিছন দিক ধরে টারজান সন্তর্পণে এগুচ্ছে, এমন সময় গাঁক করে তাকে তেড়ে এল একটা প্রকাণ্ড কুকুর। টারজান পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ল একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে।

বাড়িটার ভিতরে আলো জ্বলছে। এদিক ওদিকে চলাফেরা করছে উর্দিপরা লোকজনও। এই কুকুরটা যদি ঘেউ ঘেউ জুড়ে দেয় এইবার, তা হলেই সর্বনাশ।

না, ঘেউ ঘেউ সে জুড়লো না। সে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল টারজানের উপর। আর তক্ষুণি একটা দরোজা খুলে ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো একটা মানুষ।

কুকুরটা মস্ত। টারজানের মনে হলো কুকুর তো নয়, একটা ন্যুমা এসে আক্রমণ করেছে তাকে। টারজান হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। কুকুর ততক্ষণে লাফ দিয়েছে শত্রুর টুঁটি তাক করে। কিন্তু টারজানের টুঁটি তো আর আগের জায়গায় নেই, মাটির দিকে নেমে গিয়েছে আন্দাজ তিন ফুটের মতো। কাজেই টারজানের মাথা টপকে সে এসে মাটিতে পড়ল। আর সে এসে ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্পাতের সাঁড়াশির মতো কয়েকটা আঙুল এসে টুঁটি টিপে ধরল তার।

ভয় পেয়ে, চমক খেয়ে, ঘ্যাঁক করে একটা ডাক ছাড়ল কুকুরটা, আর থাবা বাড়িয়ে দিল, ধারালো নখে শত্রুর অনাবৃত বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দেওয়ার চেষ্টায়। কিন্তু সে চেষ্টা কি আর সফল হয়? কুকুরটার গলার হাড় ভেঙে গেল মট করে, কুকুরটাকে দূরে ফেলে দিয়ে টারজান উঠে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। আর তক্ষুণি খোলা দরোজা থেকে একটা ডাক শোনা গেল "সিম্বা!"

কে দেবে উত্তর?

কুকুরের সাড়া না পেয়ে মানুষটা ছায়াচ্ছন্ন বাগানের ভিতর নেমে এল। এগুতে লাগল অদৃশ্য টারজানের পানে। টারজান দাঁড়িয়ে আছে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না লোকটা। কিন্তু টারজান পাচ্ছে ওকে দেখতে। বিশেষ করে ওর গায়ের উর্দিটাই এখন দরকার টারজানের।

আর একটু এগিয়ে আসুক উর্দিপরা লোকটা। আর একটু! আর একটু! ব্যস্, তার ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল টারজান, ইস্পাতের সাঁড়াশির মতো তার আঙুল চেপে ধরল জার্মানটার গলা। দুই মিনিটের মধ্যে তার দশা হলো তার কুকুরের মতো। আর তার দশ মিনিটের মধ্যেই টারজান বেরিয়ে এল বাগানের অন্ধকার ছেড়ে। তার পরিধানে এখন এক জার্মান সেনানায়কের পরিচ্ছদ, নিখুঁত এবং পরিচ্ছন্ন। ডাইনে বাঁয়ে সান্ত্রীরা স্যালিউট দিল টারজানকে।

রাস্তাটা এমন কিছু লম্বা নয়। তবে লোক-চলাচল ভালই আছে। যাচ্ছে আসছে, প্রত্যেকেই এক একবার তাকিয়ে যাচ্ছে টারজানের দিকে। টারজানের সর্বাগ্রে প্রয়োজন এ-শহরের হোটেলটা খুঁজে বার করা। শহর এটা নামে মাত্র। কার্যত এটাকে এক গণ্ডগ্রাম বলাই উচিত বোধহয়। এর আর যা কিছু গুরুত্ব, তা ঐ গ্রামপ্রান্তের সেনানিবাসটার জন্য। এখানে একাধিক হোটেল থাকবে, তাও যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আবার এও অবিশ্বাস্য যে গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউই জানবে না সেই হোটেলটার ঠিকানা। জিজ্ঞাসা করলেই যে কেউ বলে দেবে যে হোটেলটা কোথায়। কিন্তু টারজানের মুশকিল হয়েছে অন্যরকম। জিজ্ঞাসা করাই যে বিপজ্জনক! জিজ্ঞাসা করার মানেই হলো এই যে সে বাসিন্দা নয় এখানকার। আর তা মেনে নিলেই তো তাকে তক্ষুণি সম্মুখীন

টুঁটি টিপে ধরল তার।

টারজান বারান্দায় উঠে পড়ল।

হতে হবে হাজার পাল্টা প্রশ্নের—"কোথাকার লোক তুমি? কেন এসেছ এখানে? হোটেলে তোমার দরকারটা কী?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐ হোটেল খুঁজে পেতেই হবে তাকে। মিচেলস্ হোটেলে না গিয়ে যাবে কোথায়? ও হলো গুপ্তচর। গুপ্তচরদের ঠিকানাটা সর্বক্ষেত্রে গোপন থাকবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। আর ঠিকানা গোপন রাখতে হলেই তো নাম-ধাম ভাঁড়াতে হয়। তা সেনানিবাসে তো তাকে অনেকেই চিনবে, সেখানে তা ভাঁড়াবার সুযোগ কোথায়? সে যে মুয়েরবার্নকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই এ শহরে এসেছে এটা প্রকাশ হয়ে গেলেই সমূহ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তারও বটে, মুয়েরবার্নকেরও বটে। সুতরাং সেনানিবাসে যাবে না মিচেলস্, এটা টারজান ধরেই নিয়েছে।

যাবে না যখন সেনানিবাসে তখন হোটেল ছাড়া তাকে স্থান দেবে কে? অতএব! হোটেলটা খুঁজে বার করা একান্তই দরকার টারজানের। সেই হোটেলেই মিচেলস্ উঠেছে। সেইখানেই আসতে হবে মুয়েরবার্নককে মিচেলস্-এর সঙ্গে দেখা করতে। অতএব, হোটেলে পৌঁছোতে পারলেই টারজান তার হীরেবাঁধানো লকেটও উদ্ধার করতে পারবে, পারবে মুয়েরবার্নকের উপরে প্রতিশোধ নিতেও।

কাউকে জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। কাজেই পথ থেকে পথান্তরে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে টারজানকে। এক ভরসা তার, এক নজর দেখলেই হোটেলকে হোটেল বলে চেনা যায়। হোটেল আর বাসগৃহের গঠনপদ্ধতি আলাদা।

তাই-ই হলো। গঠনের কায়দা পর্যবেক্ষণ করতে করতেই টারজান একসময় পেয়ে গেল হোটেলটা। বাড়িটা লম্বা, দোতলা। দোতলার পক্ষে একটু নিচুপানা। টানা বারান্দা আছে সামনে। উপরে নিচে সব ঘরেই আলো জ্বলছে। লোকজন ঘুরছে ফিরছে, তবে বেসামরিক লোক কেউ না। সেনানিবাসের সামরিক কর্মচারীরাই এসেছে ছুটির সময়টুকু আমোদ-প্রমোদে কাটাবার জন্য।

কি করণীয় এখন টারজানের? হঠাৎ ঢুকে যাওয়া ভিতরে? মিচেল্‌স বা মুয়েরবার্নকের নাম করে অনুসন্ধান করা? না, অত হঠকারী টারজান নয়। আগে আড়াল থেকে যতটা সম্ভব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে, তারপর সে সিদ্ধান্ত নেবে, কোন পথ দিয়ে কীভাবে সে ঢুকবে ভিতরে।

প্রথমে একতলার আলোকিত ঘরগুলো। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে মেরে টারজান সবগুলি ঘর দেখে নিল। কোনও ঘরেই কেউ শুয়ে বসে নেই। অতিথিরা সবাই খাওয়ার ঘরে। হয়তো ডিনারে বসেছে। এবার টারজান বারান্দায় উঠে পড়ল। আর দোতলারও ঘরগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগল জানালা দিয়ে।

সেই একই কথা। লোক কেউ নেই এসব ঘরে। সবাই নিচে। হঠাৎ টারজানের নজরে পড়ল পিছন দিকের একখানা ঘরের জানালায় খড়খড়ি নামানো রয়েছে। ভিতরে যেন কথাও শোনা যায়। টারজান গিয়ে কান পাতল সেখানে। ঠিক, কথা কইছে দুটো লোক। কী কথা, তা অবশ্য বোঝা যায় না।

এই ঘরখানারই পাশে, আর একখানা ঘর একদম অন্ধকার। টারজান বারান্দায় দাঁড়িয়ে এর জানালার পাল্লা ধরে টানলো বারকতক। আর, টারজানের ভাগ্যগুণে খুলে এলো সেই পাল্লাটা। ঘরের ভিতরে সবই নিঃশব্দ। আলসেতে ভর রেখে টারজান এইবার ভিতরে পড়ল। তবু সাড়াশব্দ নেই কারও। ঘরটা খালি।

খালি যখন, টারজান ঘরটা পেরিয়ে দাঁড়ালো ওপাশের দরজায়। বন্ধ ছিল দরজা। খুলে ফেলতেই দেখলো একটা আলোকিত হলঘর। লোক নেই সেখানেও। এই হলঘরেরই ওধারে সারি সারি শয়নকক্ষের দরজা। কোন ঘরটাতে কথা শোনা যাচ্ছিল একটু আগে, একটা আন্দাজ তো আছেই টারজানের, সেই ঘরটার দরজায় গিয়ে সে কান পেতে দাঁড়ালো। ওদিকে ঘরের ভিতরে সেই লোক দুটোও গলার স্বর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই এবার ভিতরকার কথা কতক কতক শুনতে পাচ্ছে টারজান।

(চলবে)

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

ভবিষ্যতের ঠিকানা

পদ্মা চৌধুরী

পি. টি. টিচার

তোমাদের মধ্যে কেউ পড়াশোনায় ভালো, কেউ ছবি আঁকায় ভালো, কেউ-বা খেলাধূলায় পারদর্শী। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এক একজন বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী—তোমাদের ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে নানাদিকে। পেশা বা বৃত্তির জগতে সবাইকেই প্রয়োজন।

তোমরা যারা খেলাধূলায় আগ্রহী এবং শারীরশিক্ষার চর্চা করো, তারা গোয়ালিয়রের লক্ষ্মীবাঈ ন্যাশনাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনে ডিগ্রি/পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পড়তে পারো। এখানে মোট চারটি কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা আছেঃ

(১) ব্যাচেলার অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন—৩ বছরের কোর্স; (২) মাস্টারস অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন—২ বছরের কোর্স, (৩) কর্মরত শিক্ষার্থীদের জন্য ৩ মাসের কোর্স; (৪) ১ বছরের এম. ফিল কোর্স।

উচ্চমাধ্যমিক বা সমপর্যায় পাশ করলে ব্যাচেলার অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারো। তবে বয়সসীমা থাকতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

মাস্টারস অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সে ভর্তি হতে গেলে এই বিষয়ে গ্রাজুয়েট হতে হবে।

ফিজিক্যাল এডুকেশানে ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারো। দুটি ক্ষেত্রেই আগের পরীক্ষায় শতকরা ৫০ নম্বর থাকা চাই। যেসব ছেলেমেয়ে আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে বা তফসিল জাতি/উপজাতি তাদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৫ নম্বর প্রযোজ্য।

গোয়ালিয়রের শক্তিনগরে অবস্থিত এই ট্রেনিং সেন্টারটি আবাসিক। খাওয়ার খরচ ছাড়া হস্টেলে থাকার জন্য আলাদা কোনো খরচ নাই।

ব্যাচেলার ডিগ্রি কোর্সটি পড়ার জন্য ছাত্রদের দিতে হয় ৪৫০ টাকা টিউশন ফি বাবদ। মাস্টার ডিগ্রির টিউশন ফি মাত্র ৩০০ টাকা। এছাড়া কশন ডিপোজিট দিতে হয় ২০০ টাকা। ব্যাচেলার কোর্সের জন্য ছাত্রীদের কোনো টিউশন ফি দিতে হয় না।

একজন ছাত্রকে ব্যাচেলার কোর্স পড়ার জন্য দিতে হয় ৩৮১০ টাকা কিন্তু ছাত্রীকে দিতে হয় মাত্র ১৩৬০ টাকা। অতএব মেয়েরা এই সুযোগ নিতে অগ্রণী হও।

মাস্টারস কোর্স পড়ার খরচ ছাত্রদের ক্ষেত্রে ২৬৯৯ টাকা, ছাত্রীদের ক্ষেত্রে মাত্র ৯৯০ টাকা।

দশ সপ্তাহের সামার কোর্স পড়তে ১৫৯৮ টাকা লাগবে। তবে স্কলারশিপ, ফ্রি স্টুডেন্টশিপ, বৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ভর্তির জন্য বিভিন্ন খবরের কাগজে নোটিশ বের হয়। প্রত্যেক প্রার্থীকেই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। তাছাড়া শারীরিক পরীক্ষাও দিতে হবে। শতকরা ৪০ নম্বর থাকলে ভর্তি হওয়া যায়।

ট্রেনিং সেন্টারের ঠিকানাঃ

লক্ষ্মীবাঈ ন্যাশনাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, গোয়ালিয়র ৪৭০০২।

এখানকার কোর্স শেষ হলে গ্রাজুয়েটরা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ডিরেক্টর, সুপারভাইজার, লেকচারার, পি. টি. টিচার, কোচ প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হতে পারে। চাকরির জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

জানো কী

- ☐ এক ঝটকায় প্রশান্তর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রতন তাগাটা খুলতে গেলো। আর তখনই....
- ☐ পঞ্চম জর্জের মূর্তি চুরি গেছে। বিয়ে চুকতে না চুকতেই বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেলো। বিল্লু এবার কি করবে?
- ☐ বাদশাহের ছেলে গড়গড়া ফেলে তাকালো দেবানন্দের দিকে। সকলেই চুপ, কি হয় কি হয় ভাব। কি করেছে দেবানন্দ?
- ☐ শেষকালে কিনা মালবংশের ছেলেই তাদের অন্নদাতার বিরুদ্ধে সর্বনাশা ষড়যন্ত্র আঁটলো? কেন, কি হয়েছিলো?
- ☐ আহত কনরাডকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো ম্যাম'জেল এক্স। সে তখন জানতো না তার পেছনে পেছনে....কি?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার মাঘ সংখ্যায়। সেই সঙ্গে তোমাদের মনের মতো আরো অনেক কিছু।

নতুন ধাঁধা

১। সংখ্যা নিলাম ছয়
'র' দিয়ে যোগ করলে
লাগছে ভীষণ ভয়।

—চন্দ্রকুমার। বারাসত/২৪ পরগনা (উঃ)

২। শূন্য নিয়ে যুক্ত কর
গণ্ডগোল হচ্ছে তো?
পড়েছ মহা সমস্যায়
সমাধানটা কর তো।

চন্দন ও শমিত খাঁ
হলদিয়া/মেদিনীপুর

৩। শিমূলের শেকড় কেটে
বকুলের বংশ লোপে,
মুক্তি পেলেও পেতে পার
এর চরণে জীবন সঁপে।

—দীপককুমার চৌবে
আনাড়া/পুরুলিয়া

৪। তিন অক্ষর দিয়ে গড়া
চালকগিরি করে
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে
অঙ্গে ধরা পড়ে।

—মৃত্যুঞ্জয় পাল
গৈরা/বাঁকুড়া

অগ্রহায়ণ সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ

১। পায়রা ২। পাথর
৩। সুকুমার রায়
৪। বাতিল

অগ্রহায়ণ সংখ্যার শব্দমালার উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ

১। গাজন ৩। পাতাল ৬। মন ৮। মালা ৯। মালদা ১১। মোম ১২। দই ১৪। লাবড়া ১৭। শব ১৯। হাতা ২০। বন্ধুর ২১। লিটার

উপর-নিচঃ

১। গামছা ২। জন ৪। তামা ৫। ললাট ৭। বেল ৯। মামলা ১০। দাদরা ১৩। শৈশব ১৫। বল ১৬। সেতার ১৮। বন্ধু ১৯। হাঁটা

বলো তো আমি কে

সূত্র হেঁয়ালি

খুব চেনা গল্পের নায়ক আমি। আমার পরিচয় পেতে হলে নিচের সূত্রগুলো দেখ।

সূত্র একঃ আমার এক মজার জেঠু ছিলেন। বাবার মামাতো ভাই। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন। কত কি শেখাতেন আমাকে!

সূত্র দুইঃ জেঠু আমাকে একটা ছোট মেয়ের গল্প বলেছিলেন। সে জাদুকরের দেওয়া পালকের টুপি মাথায় পরে একটা বাচ্চা ক্যাঙ্গারুর সঙ্গে যেখানে খুশি উড়ে যায়।

সূত্র তিনঃ একবার জেঠু এলেন মস্ত হাঁড়ি নিয়ে। তাতে ভর্তি কইমাছ। সেগুলো নিয়ে মা যা কাণ্ড করেছিলেন না!

সূত্র চারঃ জেঠুর বাড়ি যাব সব ঠিকঠাক, এমনি সময় মা বললেন পাড়াগাঁয়ে তিনি যাবেন না। আমারও দেখা হলো না সেই আজব দেশ।

সূত্র পাঁচঃ একদিন বাবা তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরলেন। খবর এসেছে জেঠুর স্ট্রোক হয়েছে। বাবা চললেন জেঠুর বাড়ি, সঙ্গে আমিও।

এবার বলো তো আমি কে? প্রথম সূত্র থেকে যদি আমাকে ধরতে পার তাহলে বলব অসাধারণ; দ্বিতীয় সূত্র থেকে হলে চমৎকার; তৃতীয় সূত্র খুব ভাল; চতুর্থ সূত্র ভাল; আর পঞ্চম সূত্র থেকে হলে মোটামুটি। আমার নাম?

পরের পাতায় দেখ।

নতুন শব্দমালাঃ

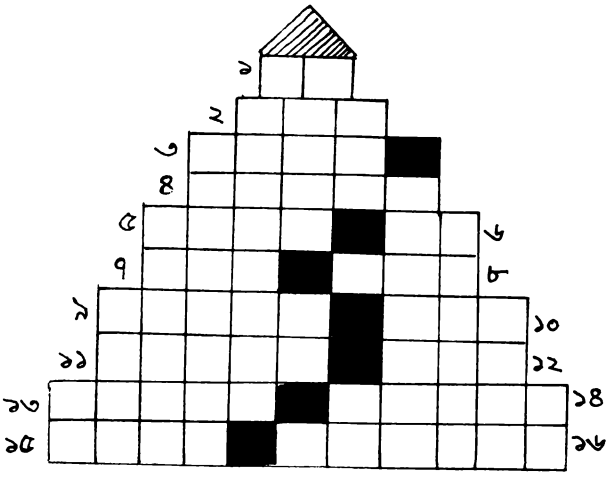

[এবারের শব্দমালা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নামে]

এটি তৈরি করেছেনঃ অপর্ণা নাহা
বদরপুর, অসম

সূত্রঃ

১। সাগরপারের রাজার হাতে/রানীর মুকুট পেলাম মাথে
২। সাত বোনের আমি বড়/কামরূপ যাও তীর্থ কর
৩। শিবাজীর দেশ/ব্যবসা চলে বেশ
৪। সাত বোনে মুখোমুখি/দিবাকরের প্রথম সখি
৫। কাব্য লেখেন শ্রেষ্ঠ কবি/মেঘের দেশের জলছবি
৬। ছোট দেশের ছিলাম হাতে/এখন কিন্তু সবার সাথে
৭। নামেতে মোর ভয় জাগে/বিদেশীরা ছিল আগে
৮। খাদ্যে আমি বড় ভাই/মাথা উঁচু থাকতে চাই
৯। বিবেক-সুভাষ-রবির করে/উজ্জ্বল আমি গর্বভরে
১০। শিক্ষা আমার বাড়ায় মান/কথাকলির পীঠস্থান
১১। র-ফলা বাদে অন্ধ/শুনে লাগে ধন্ধ
১২। শান্তির স্থান/বৌদ্ধ-জৈন ধাম
১৩। প্রথম তিনে ভাষা/পাঁচের নিচে শূন্য হলে খেতে বড়ই খাসা
১৪। আয়তনে বড় এবং মধ্যিখানে রই/ভাগ্যদোষে এখনো যে দুঃখভাগী হই
১৫। শৌর্য বীর্যে নাম/জহরব্রতের ধাম
১৬। তীর্থস্থানের সেরা/সর্বত্যাগী তপস্বীদের তাই তো বৃহৎ ডেরা

শ্রাবণ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ কলকাতা ॥

পাবু, টাবু, লাবু, রাজা, যীশু, গোগল, জয় ও রুমকি/বিজয়গড়; মনীষা, রমা, সীমা ও পৃথা/দমদম পার্ক; বাবা, মা, দাদু, পূর্বালী ও সৌভিক বসু/অটলবিহারী বসু লেন; বী, মান্তু, বুবাই ও সোমা কুণ্ডু/সিমলা রোড; সুইটি, বিউটি, সানি ও আমিন/তালতলা; মাখদুম, ইন্দু, শাহিদ, নীলু ও শামশাদ/নারকেলডাঙা;

॥ হুগলী ॥

ঈশান, সুরঞ্জনা, সুনীতি ও রেণু মুখার্জী/মাহেশ; মামুন ও বুবাই/মগুলাই, ইলসোক;

॥ হাওড়া ॥

সৌম, সৌরভ, সোনালী ও মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী/শিবপুর; পুলক মজুমদার ও নির্মল ঘোষ/কদমতলা; অনিন্দ্য ও সুপ্তা দে/আন্দুল; প্রণব, প্রমদা, অনির্বাণ, অনিরুদ্ধ, অর্ঘ্য, শতাব্দী ও দীপ্তেশ কপাট/গুড়েপোল;

॥ বর্ধমান ॥

পূর্ণেন্দু ও প্রণয় মণ্ডল/দুর্গাপুর; খোকা ও টুকুন/দুর্গাপুর; রিমি, শিল্পী ও পাপু মিত্র/ছোটনীলপুর; বাবুল, কাকলী, সুমন, দেবাশিস, শুভাশিস, জয়াশিস ও মৌসুমী মণ্ডল/লোকো কলোনী;

॥ ২৪ পরগনা ॥

শম্পা, চমলা, রিপন, পরশ, মামণি, পলাশ, বুল্টি ও নিভা/বারাসাত (উঃ); গোপাল, লাটু, মান্টু ও ব্রততী বৈদ্য/গোষ্ঠ কপাটহাট (দঃ); পাপু, পুম্পা, টাপু, টুম্পা, সান্টু, সোনা, মুনাই, দীপা, নীপা, পীযূষ ও পলাশ বৈদ্য/কাশীনগর (দঃ);

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

বিশ্বজিৎ মুখার্জী/জঙ্গীপুর;

॥ বীরভূম ॥

লাল, মামণি, সোমনাথ ও মিনু/বোলপুর;

॥ নদীয়া ॥

মৃণাল, মৃন্ময় ও মৃদুলকান্তি বিশ্বাস/কৃষ্ণনগর;

॥ মেদিনীপুর ॥

অরুণাশিস ও দীপান্বিতা আচার্য/কাঁথি;

॥ বিহার ॥

ঋতুরাজ, তমালিকা, গিরিরাজ, মাস্টারদা ও বাবা/সিংভূম; দ্বিজু, রুবেন ও নিরঞ্জন করগুপ্ত/জামশেদপুর; কালী, তারা, শিবশঙ্কর ও ইন্দ্রজিৎ প্রধান/সিংভূম; রঞ্জন, কুনা, তুনা, রনা, তমি ও খনা/জামশেদপুর;

॥ উড়িষ্যা ॥

রঞ্জনা, সোমা ও মিঠুন সিনহা/কটক;

বলো তো আমি কে-এর উত্তরঃ

আমি বুমবাই। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আজব দেশে বুমবাই' গল্পে আমার কথা জানবে।

ভাদ্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ কলিকাতা ॥

পূবালী ও শৌভিক বসু/অটলবিহারী বসু লেন; মধুপর্ণা, জবা, ঐন্দ্রিলা, সৌমি, অনুরাগ, অভিনব ও শান্তনু/যদুনাথ মুখার্জী রোড; সুইটি, বিউটি, সানি ও আমিন/তালতলা; মালবিকা, ছায়ারানী ও গৌরদাস সাহা/বেহালা স্ট্রেটাল গভঃ কোয়ার্টার্স; সুধাময়, শ্যামলী, অনন্যা ও ডায়না/বৃন্দাবন ঘোষ লেন; বাবা, মা, বাপ্পা ও টুকাই চক্রবর্তী/লাবণী এস্টেট; পাপান, ভোলু, লীলু, পিংকি ও ইন্দু/এন. এন. রোড; চামেলী ও ইন্দ্রাণী দে/বিধাননগর;

॥ ২৪ পরগনা উঃ/দঃ ॥

ইতি, প্রলয় ও শঙ্কর ঘোষ/সোনারপুর; শঙ্কর, কঙ্কর, শিপ্রা, গোপা ও মিঠু দে/বারাসাত; রিপন, চম্পা, পরশ, রাহুল, মামণি, পলাশ ও বুলটি/বারাসাত; সমীর ও অনাবিলচন্দ্র ঘোষ/ডায়মন্ড হারবার; রক্তিম ও উত্তরা মুখার্জী/বিরাটি;

॥ হাওড়া ॥

সৌম্য, সৌরভ, সোনালী ও মৃত্যুঞ্জয় ব্যানর্জী/শিবপুর; সমীরচন্দ্র মহাপাত্র/জি. আই. পি. কলোনী; অর্ঘ্য, অনির্বাণ, শতাব্দী, জয়শ্রী, প্রমদা ও দীপ্তি কপাট/গুড়েপোল; সোমা ভট্টাচার্য/কালী ব্যানার্জী লেন; বুবুন, বাচ্চু, রুমা, শুভ ও তুলতুল/নীলমণি লেন; পায়েল, কোয়েল, নীললোহিত, অর্ণব ও সঞ্চয়িতা/কদমতলা; অরবিন্দ, নির্মলেন্দু, বিমলেন্দু, অমিতাভ, অরুণাভ, অরিন্দম, আশুবালা, গীতারানী, সান্ত্বনা ও অনামিকা/দানু বোস লেন; পিয়ালী, লীনা, রীমা, টুম্পা ও বাবি/পঞ্চাননতলা; পুলক মজুমদার ও নির্মলেন্দু ঘোষ/পঞ্চাননতলা; রঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, নমিতা বসু/সাতকড়ি চ্যাটার্জী লেন; বুম্বা, রূপক, পাপিয়া, কাঞ্চন ও শিপ্রা মাজী/বি. ই. কলেজ; প্রদীপ, বিজলী ও আকাশ/সদর বক্সী লেন; রমেশ ও নির্মল/বাবুই পাড়া, ডোমজুড়; সুদীপ ও কাকলী/বি. গার্ডেন; বাবুন, ফুচি, বোনা ও পাপাই/সদর বক্সী লেন;

॥ হুগলী ॥

মৌসুমী মুখার্জী/চন্দননগর; পার্থ, মীরা, মিতালী ও কনক ব্যানার্জী/চণ্ডীতলা;

নিশ্চিন্তে ছোটদের হাতে তুলে দেবার মতো দুর্দান্ত একটি বই

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আজব দেশে বুমবাই

দামঃ ১৪ টাকা মাত্র

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ,
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

গোলকধাঁধা

বর্গক্ষেত্র-ত্রিভুজ-বৃত্ত পর পর এই তিনটির মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরি করে এগোতে হবে।

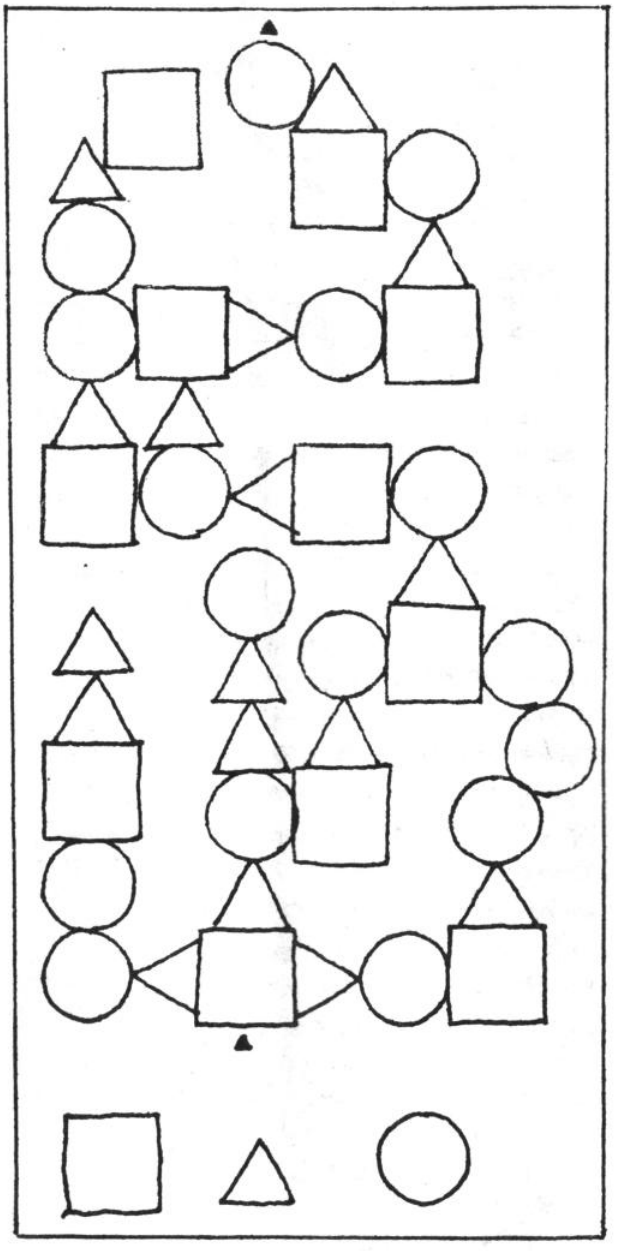

উত্তর আগামী সংখ্যায়।

মজার খবর

বরুণ মজুমদার

গায়ক ইঁদুর

আমরা জানি কয়েক ধরনের পাখি আছে যারা মিষ্টি সুরে গান গাইতে পারে। তোতা পাখি বা কাকাতুয়া মানুষের মতো কথা বলছে— এটাও প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু কোনো ইঁদুর গান গাইছে এটা ভাবতেই অবাক লাগে। জানি না এই ধরনের গায়ক ইঁদুর দেখলে বিড়ালরা তাদের গানে মুগ্ধ হয়ে শিল্পী ইঁদুরের গান শুনতে বসে পড়বে কিনা! আমাদের দেশে রেডিওতে ইঁদুরের গান আমরা শুনিনি, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেডিওতে একটা ইঁদুরের গান শুনিয়ে শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে শোনা গেছে। সুতরাং ইঁদুরকুলে ঐ ইঁদুরটা নিশ্চয় কৌলিন্যের দাবি করতে পারে। কেননা সে এখন রীতিমতো বেতারশিল্পী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছুদিন আগে মিস্টার রিচার্ড পি স্টেনার নামে এক ভদ্রলোক এমন একটা ইঁদুর ধরেছিলেন যেটা ক্যানারী পাখির মতো সুরেলা কণ্ঠে গান গাইত। সেই ইঁদুরটাকে তিনি একটা ক্যানারী পাখির খাঁচায় পুরে দিলেন। আর আশ্চর্য ইঁদুরটা সব কিছু ভুলে ঐ ক্যানারী পাখিটার সঙ্গে দ্বৈত সঙ্গীত শুরু করে দিল। তার গান শুনে অনেকে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সত্যিই কি ইঁদুর গান গাইতে পারে? এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নানারকম গবেষণা চালিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের এই সব গবেষণার ফলে জানা গেছে যে পৃথিবীতে এমন এক ধরনের ইঁদুর আছে, যারা পাখির মতো সুরেলা কণ্ঠে সুর সৃষ্টি করতে পারে। ইঁদুরের প্রজাতির মধ্যে এই ধরনের গায়ক ইঁদুরের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এই ধরনের ইঁদুরের কণ্ঠস্বর অনেকটা ক্যানারী পাখির কণ্ঠস্বরের মতো। ঠাণ্ডা লেগে ইঁদুরের সর্দি হলে বা এ ধরনের কোনো অস্বাভাবিকতার জন্য তাদের কণ্ঠনালী থেকে এরকম আওয়াজ বের হয় বলে কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন। অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট হলেই ইঁদুরের কণ্ঠ থেকে এই ধরনের আওয়াজ বের হয়।

তবে এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামকরা প্রকৃতিবিজ্ঞানী মিঃ রয় চ্যাপম্যান যা বলেছেন, তাতে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। তিনি জানিয়েছেন যে, কিছুদিন আগে চীনে তিনি এমন একটা ইঁদুর পেয়েছিলেন, যে ইঁদুরটা হুবহু ক্যানারী পাখির মতো গান গাইতে পারে। অনেকদিন ধরে তিনি সেই ইঁদুরটার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তার কণ্ঠনালীতে কোনোরকম অসুস্থতার সন্ধান তিনি পাননি। সুতরাং সর্দি হলে বা অসুস্থ হলে ইঁদুরের কণ্ঠনালী থেকে এই অস্বাভাবিক আওয়াজ বের হয়—এ যুক্তি তিনি মানতে রাজী নন।

আমাদের ঘরের মধ্যে অনেক সময় রাত্রে ইঁদুর চলাফেরা করে, তারা যদি মাঝরাতে এই ধরনের গান শোনাতে আরম্ভ করে দেয় তবে কেমন হবে বল তো? তোমরা নিশ্চয়ই ইঁদুরের গান শুনতে শুনতে ঘুম চোখে বিছানায় উঠে বসবে, তাই না?

উষ্ট্রকন্যা

সমুদ্রে মৎস্যকন্যার কথা আমরা শুনেছি। এদের শরীরের ওপরের দিকটা দেখতে নাকি অবিকল মেয়েদের মতো, আর কোমরের নিচে থেকে মাছের রূপ। এবার যার কথা বলছি, তাকে দেখতে কিন্তু উটের মতো নয়। তিনি অস্ট্রেলিয়ার এক সুন্দরী। মডেল হিসাবে তিনি কাজ করে থাকেন। নাম মিস রবিন ডেভিডসন। নিছক অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় তিনি উটের পিঠে চড়ে এক হাজার তিন শ' কিলোমিটার দীর্ঘ গিবসন মরুভূমি অতিক্রম করেছেন। তাঁর সময় লেগেছিল চার মাস। অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিকরা এই মহিলার নাম দিয়েছেন উষ্ট্রকন্যা। হ্যাঁ, উটের পিঠে এতদিন পথ চলাতেই তাঁর এই নতুন নামকরণ করা হয়েছে।

ছবি : স্বাতী ভট্টাচার্য

হাঁদা-ভোঁদার
ক্লে পিজিয়ন
না! তুমি আমাদের ক্লে পিজিয়ন শুটিং ক্লাবে যোগ দিতে পারবে না, আমাদের সভ্যেরা বন্দুক ব্যবহার করে, গুলতি নয়!
ওফ্স!
হেঃহেঃ! খেলি তো ঘাড় ধাক্কা! দ্যাখ! আমি আমার নিজের শুটিং ক্লাব বানিয়ে প্র্যাকটিশ করছি। তুই এই প্লেটটা ঠিক ক্লে পিজিয়নের মতো ওপর দিকে ছুঁড়ে দে, আর আমি ওটাকে ঠিক লাগাবো।
বাঃ, চমৎকার! এবার লক্ষ্য কর!
ওপস! আমি ফস্কে প্লেটটার বদলে ফুলের টবটাকে লাগিয়েছি।
মরেচে! তোর বরাতটাই গোলমেলে, ভোঁদা!
ঘপাস!
উফ্!
এগুলি দেখে দারুণ আইডিয়া এসেছে, ভোঁদা! এই দিয়েই ক্লে পিজিয়ন উৎক্ষেপণ করবো।
এবার আমার টার্গেট আমি নিজেই শূন্যে উৎক্ষেপ করছি, ভোঁদা! এই দ্যাখ্।
এঃহে! এটাও ফস্কালো!

তুই এতো জোরে ঝাঁপালি যে তোর ক্লে পিজিয়ন বেড়ার ওপাশে চলে গেলো হাঁদা!
মালকড়ি কি আছে ছাড়ুন, ঝটপট!
বাবা রে! গেছি রে!
তোর ক্লে পিজিয়নকে তুই লাগাতে পারিসনি হাঁদা! কিন্তু তোর ক্লে পিজিয়ন কাউকে ঠিক লাগিয়েছে।
তোমাদের মধ্যে কে কাঠের গুঁড়ি ছুঁড়ে চোট লাগিয়েছে?
এই যে, ভোঁদা ছুঁড়েছে!
চমৎকার করেছো! এই ছিনতাইবাজটার হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছো, ভোঁদা! তার পুরস্কার স্বরূপ—
এই হাজার টাকা তোমাকে দিলাম। তুমি তোমার খুশীমতো কিছু কিনো।
খুবই খুশীর সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ!
হিঃ হিঃ! এবার আমি আমার শুটিং প্র্যাক্‌টিসের জন্যে নিজের পছন্দমতো ক্লে পিজিয়ন রেঞ্জ পেয়েছি! আর যা টাকা আছে তাই দিয়ে কয়েকদিন মেলায় এই খেলা খেলতে পারবো, হাঁদা!
শুটিং রেঞ্জ
খ্যাঁক!

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

স্বামী মুক্তিকামানন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামীজী ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে ভালোবাসতেন। একটা লাঠি আঙুলের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মজা করতেন আর বাচ্চারা তাঁর মতো করতে গিয়ে নাকাল হলে তিনি হাসিতে ফেটে পড়তেন।

শহরের আশপাশের চার্চে, মহিলা সমিতিতে, স্কুলে-কলেজে ১৫ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট তিন সপ্তাহে এগারটি বক্তৃতা দিয়ে স্বামীজী চিকাগো ধর্মসভার প্রস্তুতিপর্ব শেষ করেন।

অধ্যাপক রাইট স্বামীজীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার চিকাগোয় পাঠিয়ে দিতে চাইলেন ধর্মসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে। স্বামীজী ভারত থেকে এসে ধর্মসভায় প্রতিনিধি হওয়া বা শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকা সবটাই অসম্ভব বিবেচনা করে বস্টন চলে এসেছিলেন ; এখান থেকেই ভারতের বাণী স্বাধীনভাবে ভারতীয় কায়দায় প্রচার করবেন এমন মনোভাব নিয়ে। ধর্মসভায় যোগদানের বাসনা মন থেকে মুছেই ফেলেছিলেন। কিন্তু এই তিন সপ্তাহে চিকাগো থেকে দূরে সুন্দর শহর বস্টনে অলক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে প্রস্তুত করে নিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে স্বামীজী আমেরিকানদের মনোরাজ্যের সব পরিচয় পেয়ে গেছেন। কারণ তিনি মিশেছেন অধ্যাপক-পণ্ডিত-সমাজসেবী মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। দেখেছেন তাঁদের সংশোধনাগার। থেকেছেন বিভিন্ন পরিবারে। এত ঘনিষ্ঠতার ফলে নিজেই তিনি তাঁদেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন।

অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর বাগ্মিতা-পাণ্ডিত্য আর ঈশ্বরনির্ভরতা দেখে তাঁকে ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন। এ ব্যাপারে সবরকম সাহায্যও করলেন। তিনি স্বামীজীর পরিচয়পত্রে লিখে দিলেন, 'এঁর পাণ্ডিত্য আমাদের সমস্ত বিদগ্ধ অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য একত্র করলে যা হয় তার চেয়েও বেশি। ইনি সূর্যতুল্য, যার কিরণ বিস্তারের জন্য প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন হয় না।'

তখন চিকাগোয় মেলা দেখতে যাওয়ার জন্যে সস্তায় ট্রেনের

টিকিট বিক্রি হচ্ছিল। অধ্যাপক রাইট তাই একখানা কেটে দিয়ে স্বামীজীকে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে এলেন; পিতা যেন কর্মক্ষম পুত্রকে যুদ্ধজয় করতে কর্মক্ষেত্রে পাঠাচ্ছেন।

আবার চিকাগোয়

শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আবার নতুন করে সমস্ত যোগাযোগ হয়ে যেতে স্বামীজী নিশ্চিন্তমনে চিকাগোয় চললেন। ট্রেনে একজন ব্যবসাদারের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি খুশি হয়ে স্বামীজীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন ডঃ ব্যারোজ যে অঞ্চলে থাকেন, স্টেশন থেকে সেখানে কিভাবে যেতে হবে সব তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন।

সন্ধ্যায় ট্রেন যখন চিকাগো স্টেশনে পৌঁছাল তখন ভদ্রলোক তাড়াহুড়ায় তাঁর প্রতিশ্রুতি ভুলে নিজের বাড়ি চলে গেলেন। এদিকে পকেটে হাত দিয়ে স্বামীজী দেখেন ব্যারোজের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন। পথে নেমে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হা-হতোস্মি! এরা স্বামীজীর ইংরাজী বোঝে না, ওদের ভাষাও স্বামীজী বোঝেন না। শহরের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল জার্মান দেশ থেকে আসা লোকের বাস। তারা প্রশ্ন না বুঝে নীরবে নিজ পথে চলে যায়।

রাত ঘনিয়ে আসছে। স্বামীজী বুঝলেন একটি হোটেলে আশ্রয় নেওয়া উচিত, অথচ এ কথাটা কাউকে বোঝাতে পারছেন না যে তিনি একটা হোটেলে যেতে চান। শেষে একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থায় স্টেশনে ফিরে এসে দেখতে পেলেন দূরে রেল-ইয়ার্ডে অনেকগুলো ফাঁকা বক্সওয়াগন একধারে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ঠিক করলেন শীতের রাতটা ওই ওয়াগনগুলোর কোনো একটাতে শুয়ে কাটিয়ে দেবেন। দিনটা ছিল ৮ বা ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। শ্রীরামকৃষ্ণের কী লীলা! দুদিন পরে যাঁর বাণী শুনে আমেরিকাবাসী তথা বিশ্ববাসীর ধর্মচেতনা জাগবে, নিজেদের ভিতরেই যে ঈশ্বর আছে তার আশ্বাস পাবে, তিনিই আজ নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, বন্ধুহীন, অপরিচিত-অবজ্ঞাত! এমন অবস্থার মধ্যে পড়ে স্বামীজীর অবশ্য কিছু যায় আসেনি। তাঁর অখণ্ড শিবভাবে কোনো অবস্থাতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

পরদিন সকালে চোখে-মুখে স্নিগ্ধ-জলের হাওয়া পেয়ে তিনি সেই দিকেই চলতে থাকলেন। ক্রমশ তিনি একটা বিরাট হ্রদের তীরে উপস্থিত হলেন। এই 'লেকশোর ড্রাইভ'-এর ধারে ক্রোড়পতি বণিকদের বাস। স্বামীজী ভারতীয় সন্ন্যাসীদের রীতি অনুযায়ী 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ক্ষুধানিবৃত্তি আর ব্যারোজের ঠিকানা চাই। কিন্তু এ যে অন্য সভ্যতা! সন্ন্যাসীর বেশ দেখলে মর্যাদা দেয় না। ময়লা কিম্ভূতকিমাকার পোশাক, কালো রং আর ক্লান্ত চেহারা দেখে অনেকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দিল। ভৃত্যরা হাসি-ঠাট্টা করে দরজা বন্ধ করে দিল। ক্লান্ত স্বামীজী পথের পাশে বসে পড়লেন। এমন সময় সামনের বাড়ির দরজা খুলে রাজরানীর মতো সুন্দরী এক মহিলা রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে এলেন। স্বামীজীর সামনে দাঁড়িয়ে

মৃদু ভক্তিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি? স্বামীজী নিজের সমস্যার কথা খুলে বললেন। অমনি সেই মহিলা তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে স্বামীজীর স্নানাহার ও বিশ্রামের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন যে স্বামীজীর সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি তাঁকে ডঃ ব্যারোজের অফিসে নিয়ে যাবেন। এ আর এক রূপকথা। বিপদে পড়লেন, আবার বিপদ থেকে উদ্ধারও হলেন।

করুণাময়ী এই মহিলাটি জর্জ ডব্লিউ হেল-এর পত্নী শ্রীমতী হেল। হেল দম্পতি ছিলেন অতি ধার্মিক, তাই স্বামীজী তাঁদের ডাকতেন 'ফাদার পোপ' ও 'মাদার পোপ' বলে। আর হেলদের দুই কন্যা ও দুই ভাগ্নী ছিলেন স্বামীজীর 'হেল সিস্টারস'।

হেল স্বামীজীকে মহাসভার অফিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে অধ্যাপক রাইটের পরিচয়পত্র দেখাতেই বিনা বাক্যব্যয়ে স্বামীজীকে ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি করে নেওয়া হলো। এবার তিনি রীতিমতো ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি। তাই তাঁর থাকা-খাওয়ার, সুখ-সুবিধার দায়িত্ব সভাপরিচালকেরাই নিলেন।

স্বামীজীকে খুব ধনী এক বিশিষ্ট পরিবারে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো।

স্বামীজীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হলো ২৬২ মিশিগান অ্যাভেনিউ-র জে বি লিয়নের বাড়িতে। এই বাড়ির লোকেরা এমন একজন ধর্মপ্রতিনিধিকে রাখতে চেয়েছিলেন যিনি ধর্মমতে উদার হবেন, যাঁর সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করা যাবে। মেলা দেখতে এসে বহু অতিথি, আত্মীয়স্বজন তাঁদের বাড়িতে উঠেছিলেন। আর একজনও থাকার মতো জায়গা নেই। তাই শেষমুহূর্তে সন্ধ্যেবেলায় একজন প্রতিনিধি আসবেন শুনে শ্রীমতী লিয়ন মেজছেলেকে তার ঘর ছেড়ে দিয়ে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকতে বললেন। পরে খবর এল যে নতুন অতিথিটি অনেক রাত্রে আসবেন।

৯ বা ১০ সেপ্টেম্বরের গভীর রাত

শ্রীমতী লিয়ন ছাড়া সবাই শুয়ে পড়েছেন। গভীর রাত্রে দরজায় ঘণ্টা বাজল, শ্রীমতী লিয়ন দরজা খুলে অতিথিকে দেখে স্তম্ভিত। লম্বা গেরুয়া আলখাল্লা পরা। পূর্বে তিনি কোনো ভারতবাসীকে দেখেননি। যাই হোক, নিজের বিস্ময় আর অস্বস্তি মনের মধ্যে চেপে রেখে স্বামীজীকে তাঁর থাকার ঘর ও অন্যান্য ব্যবস্থা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে শুতে চলে গেলেন। কিন্তু শুয়েও চোখে ঘুম নেই, স্বামীকে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা বলতেই হবে। লিয়ন এদিকে ঘুমাচ্ছেন অঘোরে। শ্রীমতী লিয়ন অপেক্ষা করতে থাকেন কখন স্বামীর ঘুম ভাঙবে।

লিয়নের ঘুম ভাঙতেই শ্রীমতী লিয়ন বললেন, দক্ষিণ অঞ্চলের অতিথিরা শ্বেতাঙ্গ লোক ছাড়া অন্যদের সঙ্গে কথাই বলবে না। তাহলে কি নতুন অতিথিকে কাছের 'অডিটোরিয়াম হোটেলে' রাখার ব্যবস্থা করব? সব চুপচাপ শুনে গেলেন লিয়ন। তারপর প্রাতঃরাশের আধঘন্টা আগেই লাইব্রেরি ঘরে গেলেন কাগজ পড়তে। ঘরে স্বামীজীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে সুপ্রভাত জানিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর প্রাতঃরাশ পরিবেশন হওয়ার আগে তাঁর স্ত্রীকে এসে জানালেন, এমিলি, আমাদের সব অতিথি চলে গেলেও আমার এতটুকু দুশ্চিন্তা হবে না। আমাদের ঘরে এ যাবৎ যত লোক এসেছেন তাঁদের মধ্যে এই ভারতবাসীটি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও চিত্তাকর্ষক। তিনি যতদিন খুশি এখানে থাকবেন।

স্বামীজীর সঙ্গে লিয়নের এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে স্বামীজী 'চিকাগো ক্লাবে' এক সমাবেশে সকলের সামনে লিয়নকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আমি যত লোক দেখেছি, আমার বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত লিয়ন সবচেয়ে বেশি খ্রীস্টসদৃশ।' স্বামীজীর কথায় লিয়ন খুব বিব্রতবোধ করেছিলেন।

(চলবে)

ছবি: বিজন কর্মকার

এখন শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লির ডুরাণ্ড, বোম্বাই-এর রোভার্স, কলকাতার আই এফ এ শীল্ড কিংবা লীগের খেলা এখন আর পাত্তা পাচ্ছে না ক্রিকেটের কাছে। তা পাবেই বা কেন! শীতকাল মানেই তো ক্রিকেটের ভরা মরশুম। সবে শেষ হয়েছে হিরো কাপের খেলা। সি এ বি'র হীরক জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ হিসেবে হিরো কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়ে গেলো পাঁচটি দেশকে নিয়ে। পাকিস্তান আসেনি শিবসেনার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে আর ভারত খেলেছিলো এই প্রতিযোগিতায়। ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড খেলতে আসেনি আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও। না আসার কারণ হিসেবে তারা যা বলেছে তা নেহাতই ঠুনকো। মনে পড়ছে, এর আগে ভিক্টোরিয়া তাদের জয়ন্তী উৎসবে সি এ বি'র মতোই একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলো। সেই প্রতিযোগিতায় খেলার জন্যে ভারতকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। ভারত কিন্তু ইতস্ততঃ করেনি, আমন্ত্রণ পেয়েই সেখানে খেলতে গিয়েছিলো। অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সে কথা মনেও রাখলো না। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বিভিন্ন দেশ এইরকম ধরনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে। ভারতকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় খেলতে যাবার আগে ভারতের ভেবে দেখা উচিত ঐ প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়া সঙ্গত, না সঙ্গত নয়। কারণ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ! ওরা আমাদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করবে আমাদেরও সেই রকম করা উচিত। এইসব কারণেই তো একবার ক্রিকেট বিশ্ব দুভাগে ভাগ হয়ে যেতে বসেছিলো। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী নীতির জন্যে কোনো দেশ তাদের সঙ্গে ক্রীড়া সম্পর্ক রাখতো না। কিন্তু ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলতো। অবশ্য অন্য নামে। ফলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো যাতে মনে হয়েছিলো, ক্রিকেট বিশ্ব বুঝি দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের সাসপেন্ড করে, শাস্তি দিয়ে সেই পরিস্থিতির হাত থেকে নিজেদের বাঁচায় ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড। অবস্থা এখন বদলেছে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতে এসে হিরো কাপে খেলে গেলো। কিন্তু ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এলো না। এই তিনটি দেশের না আসাটা ভারত কিভাবে নেয়, সেটাই দেখার বিষয়।

তবে ভারত এখনই তেমন কিছু করবে না। কারণ পরবর্তী বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এই উপমহাদেশে হবে। ভারত, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কা একসঙ্গে দায়িত্ব পেয়েছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করার। বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার জন্যে এই মুহূর্তে ভারত নিশ্চয়ই চুপচাপ থাকবে। কিন্তু

ভবিষ্যতে সুযোগ বুঝে যে ফোঁস করে উঠবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

তবে হিরো কাপে পাকিস্তান না আসায় জল ইতিমধ্যে ঘোলা হতে শুরু করেছে। শিবসেনা বলেছে, বিশ্বকাপেও পাকিস্তানকে ভারতের কোথাও খেলতে দেবে না। শুধু তাই নয়, যারা পাকিস্তানের সঙ্গে খেলবে তাদেরও খেলতে দেওয়া হবে কিনা সেই বিষয়ে তারা চিন্তা করে দেখবে। ফলে অবস্থাটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আর সেই সুযোগটাই নিতে চাইছে ইংলন্ড। তারা সম্ভবত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের কাছে প্রস্তাব দেবে, ভারতের ঐ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক এবং তা দেওয়া হোক ইংলন্ডকে। কারণ এর আগেরবারের প্রতিযোগিতার দায়িত্ব পড়েছিলো অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের ওপর। তাই ভারত, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কাকে একসঙ্গে দায়িত্ব না দিয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দায়িত্ব দেওয়া হোক ইংলন্ডকে। ফলে ব্যাপারটা যে ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে যাই হোক না কেন, বিশ্বকাপের দায়িত্ব থেকে এত সহজে যে ভারত, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কাকে বঞ্চিত করা যাবে না সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সম্ভবত দক্ষিণ আফ্রিকাও চাইবে না বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার স্থান

বদলাক। তবে বিশ্বকাপের সময়ও যদি এবারের মতো গোলমাল হয় তাহলে তা হবে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার।

এই শীতের শেষের দিকে পাকিস্তানের ভারতে আসার কথা ছিলো। কিন্তু পাকিস্তান যে আসছে না সে কথা এখন নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ফলে ভারতও এশিয়া কাপে খেলতে পাকিস্তানে যাবে না। তাই হয়তো

আবার মারাদোনা আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের অধিনায়ক

ভারতীয় দল খেলতে যাবে নিউজিল্যান্ডে। আজহারের দল নিউজিল্যান্ডে খেলতে গেলে হয়তো কপিলদেব সে দেশেই গড়বেন বিশ্ব রেকর্ড। সবথেকে বেশি উইকেট দখলের রেকর্ড এখন নিউজিল্যান্ডের স্যার রিচার্ড হ্যাডলির। হ্যাডলির দেশে বসে কপিল যদি হ্যাডলিরই রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন তাহলে ব্যাপারটা জমবে দারুণ। আমরাও সেই আশা করবো।

ইডেনে ভারতীয় ক্রিকেটাররা

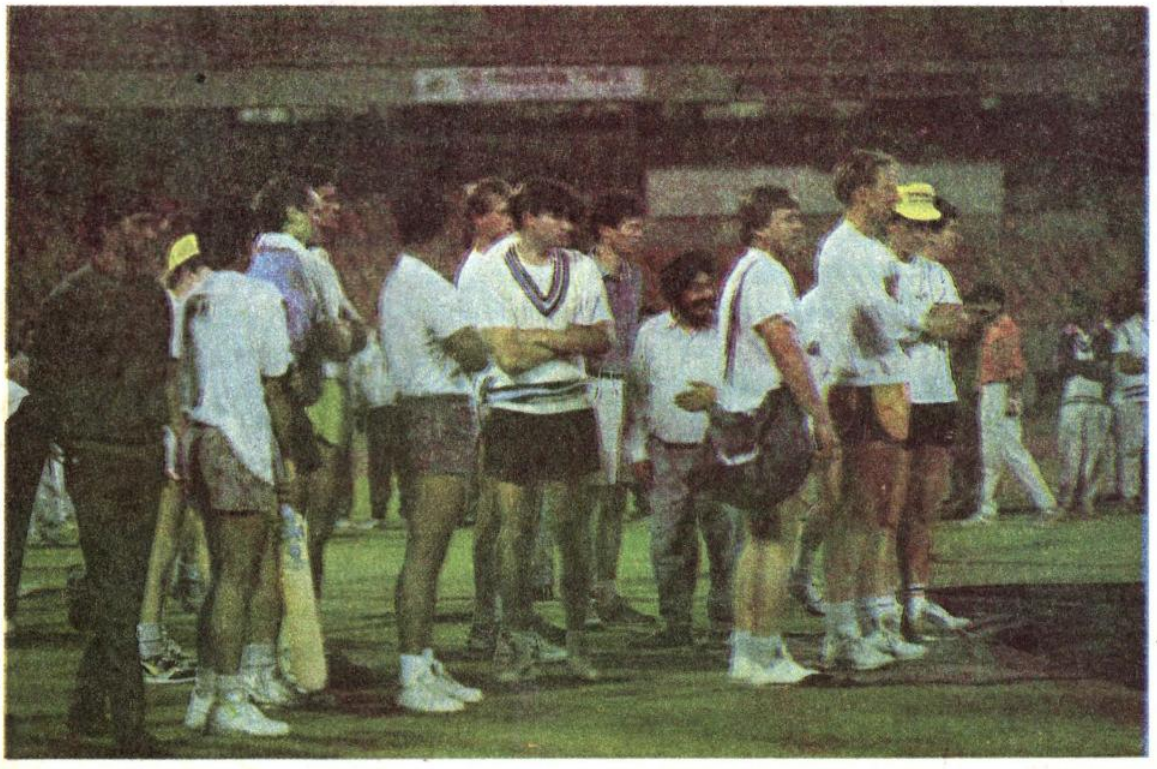

দিল্লিতে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা

খবর টবর

নির্বাসন

বেন জনসন আর কোনোদিন কোনো প্রতিযোগিতায় দৌড়তে পারবেন না। তাঁকে সারা জীবনের মতো সাসপেন্ড করা হয়েছে। সিওল ওলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে কার্ল লিউইসকে হারিয়ে বিশ্বের দ্রুততম মানুষ হবার পরই বেন জনসন ড্রাগ টেস্টে ধরা পড়েন। তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় সোনার মেডেল। তা পরিয়ে দেওয়া হয় কার্ল লিউইসকে। বেন জনসনকে দু বছরের জন্যে সাসপেন্ড করা হয়। শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর বেন জনসন আবার দৌড়তে শুরু করেন। কিন্তু সুবিধে করতে পারছিলেন না কিছুতেই। তবে এই বছরের গোড়া থেকে আবার দুর্দান্তভাবে দৌড়তে শুরু করেন বেন। চমকে ওঠার মতো সময় করতে লাগলেন তিনি। আবার কাগজে কাগজে লেখালেখি শুরু হলো, আবার পুরোনো মেজাজে বেন জনসন। গত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে ডোপ টেস্ট হলো। দেখা গেল বেন জনসন আবার উত্তেজক ওষুধ খেতে শুরু করেছেন। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক সংস্থার নিয়ম হলো, কেউ যদি দু দুবার ডোপ টেস্টে ধরা পড়েন তাহলে তাঁকে সারা জীবনের মতো সাসপেন্ড করা হবে। তাই হলো বেন জনসনের। মাত্র ৩১ বছর বয়সে নির্বাসনে গেলেন তিনি। আর কোনোদিন তিনি ট্র্যাকে নামতে পারবেন না। ড্রাগ খাওয়ার কথা অস্বীকার করে জনসন বলেছেন, এ সবই চক্রান্ত। আমার বিরুদ্ধে মস্ত ষড়যন্ত্র। ঠিক আছে আমি আর কোনোদিন দৌড়বো না। আমি অবসর নিলাম।

হ্যালো ডলি

তোমরা যারা গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনির ফ্যান তাদের জন্যে দারুণ একটা খবর আছে। এবার তোমরা ইচ্ছে করলেই সাবাতিনিকে কাছে রাখতে পারবে। কি করে? কিচ্ছু না, একটা পুতুল কিনে। 'সাবাতিনি ডল' বের করেছেন টেনিস পোশাক-পরিচ্ছদ আর খেলার সামগ্রী কোম্পানির মালিক সার্গিও তাচিনি। সাবাতিনির নামে তাঁর কোম্পানির জিনিসপত্তরের নাম দিয়েছেন গ্যাবি প্রোডাক্টস। এবার বের করলেন হ্যালো ডলি—সাবাতিনি-পুতুল। এই পুতুলের দাম কতো তা অবশ্য এখনো জানা যায়নি। তবে এ কথা ঠিক আজ না হয় কাল নয়তো পরশু ঐ 'হ্যালো ডলি' আমাদের দেশেও এসে যাবে।

বথামের ছেলে

ইয়ান বথামের ছেলের ওপর এখন চোখ পড়েছে ইংলন্ডের ক্রিকেট কর্তাদের। ভারতের কাছে গো-হারা হেরে দেশে ফেরার পর এখন তরুণ প্রতিভা খুঁজে বের করার জন্যে তাঁরা হন্যে হয়ে উঠেছেন। বথামের ছেলে লিয়ামের বয়েস পনেরো। ভালোই ক্রিকেট খেলে। ইংলন্ডের আন্ডার ফিফটিন দলের খেলোয়াড়। ইংলন্ডের দুটো কাউন্টি দল ইয়র্কশায়ার আর ল্যাঙ্কাশায়ার লিয়ামকে খেলানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা এই মরশুমেই লিয়ামকে তাদের প্রথম দলে খেলাতে চায় যাতে নির্বাচকরা ওর খেলা ভালোভাবে দেখতে পান। বেচারা লিয়াম অতোটা ভাবেনি। সে তার পড়াশোনা আর খেলা নিয়ে দিব্যি ছিলো। কি করবে বুঝতে পারছে না। ওর বাবা ইয়ানের কাঁধে অপারেশন হয়েছে। তাই এক্ষুণি কিছু বলতেও পারছে না। কাউন্টি ক্রিকেটে এ বছর ও আদৌ খেলবে কিনা আর খেললে কোথায় খেলবে তা ঠিক করবেন ওর বাবা। তিনি নার্সিং হোম থেকে ফেরার পর সব ঠিক হবে। তবে লিয়াম বথামের নামটা মনে রাখতে হবে। হয়তো দুচার বছরের মধ্যে ইংলন্ড দলে তাকে দেখাও যেতে পারে। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, বাবার মতো লিয়ামও কিন্তু ফুটবলটা ভালোই খেলে।

বিদায় শ্রীকান্ত

ভারতীয় ক্রিকেটের সব থেকে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী রোমাঞ্চকর ব্যাটসম্যান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত ব্যাট-প্যাড তুলে রেখেছেন। আর তিনি খেলবেন না। তাঁর আশা ছিলো একদিনের ক্রিকেটে আরো কিছুদিন হয়তো তাঁকে খেলতে দেওয়া হবে। কিন্তু তা হলো না। ক'বছর আগে পাকিস্তান সফরে তাঁকে অধিনায়ক করা হয়েছিলো। সেবারই পাকিস্তানে গিয়ে শচীন তেণ্ডুলকার প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে শুরু করেন। তা শ্রীকান্তর নেতৃত্বে ভারতীয় দল পাকিস্তানে গিয়ে ভালোই খেলেছিলো। কিন্তু পাকিস্তান সফরের পর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের কর্তাদের কাছে ব্রাত্য হয়ে গেলেন। কারণটা এতোদিনে জানা গেছে। সেইসময় ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি রাজ সিং শ্রীকান্তকে কপিলদেব সহ কয়েকজন সিনিয়ার খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন। শ্রীকান্ত রাজী হননি। ফলে তিনি ওঁদের চোখে খারাপ হয়ে গেলেন এবং পুরো ফর্মে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া আরম্ভ হলো।

ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিনটি বিভাগেই শ্রীকান্ত ছিলেন তুখোড়। তবে তাঁর ব্যাটের ঝাঁজ ছিলো দুর্দান্ত। কোনো বোলারকেই তিনি পরোয়া করতেন না। শ্রীকান্ত প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান যখন তাঁর বয়েস ২২। ১৯৮১ সালে তিনি প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেছিলেন। খেলেছিলেন ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। তবে আজ আর এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে টেস্টের চেয়ে একদিনের ক্রিকেটের খেলোয়াড় হিসেবে শ্রীকান্ত ছিলেন অনেক বড়। তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিটি করেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৮৬ সালে। মাত্র ৯৭টি বল খেলেই তিনি তুলে নিয়েছিলেন একশ রান। এক বছর পরে মাদ্রাজে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি করলেন মাত্র ১১৮টি বল খেলে। শ্রীকান্তের খেলোয়াড় জীবনের ইনিংসগুলোর দিকে তাকালে এইরকম অনেকই দুরন্ত ব্যাটিং-এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। তাই তো তাঁকে টরনেডো বলা হতো। ভারতীয় ক্রিকেটের সব থেকে রোমাঞ্চকর ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি পরিচিত। ভারতের পক্ষে তিনি ৪৩টি টেস্টের ৭২টি ইনিংসে ৩ বার অপরাজিত থেকে ২০৬২ রান করেছেন। গড়ে ইনিংস প্রতি তাঁর রান ২৯.৮৮। সর্বোচ্চ ১২৩। সেঞ্চুরি ২টি। হাফ সেঞ্চুরি ১২টি। ক্যাচ ৪০টি। আর একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪৬টি ম্যাচের ১৪৫টি ইনিংসে ব্যাট করে ৪ বার অপরাজিত থেকে ৪০৯২ রান করেছেন। ইনিংস প্রতি গড় রান ২৯.০২। সর্বোচ্চ ১২৩ রান। সেঞ্চুরি ৪টি। হাফ সেঞ্চুরি ২৭টি।

ক্যাচ লুফেছেন ৪২টি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর সব থেকে ভালো বোলিং—২৭ রানে ৫টি উইকেট নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৮৮-৮৯ সালে বিশাখাপত্তনমে। প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনিই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০০-এর ওপর রান করেন এবং চারটি সেঞ্চুরি করেন। অংশুমান গায়কোয়াড় ও চেতন শর্মার পর শ্রীকান্তই টেস্ট ক্রিকেটে গাভাসকারের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের সূচনা করেছেন মোট ২৪টি ম্যাচে।

ডুরান্ড কাপ

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবারের ডুরান্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে তারা এক গোলে হারিয়ে দেয় পাঞ্জাবের স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে। খেলার একমাত্র গোলটি করেন সঞ্জয় মাঝি। মোহনবাগান আর মহামেডান স্পোর্টিং বিদায় নেবার পর কলকাতার মান রাখার দায়িত্ব ছিলো ইস্টবেঙ্গলের। খুব একটা ভালো না খেললেও ফাইনালে জিতে ইস্টবেঙ্গল বাংলার ফুটবলের সম্মান বাড়িয়েছে। এর আগে ইস্টবেঙ্গল ১৯৪৯, ১৯৬২ (অন্ধ্র পুলিশের সঙ্গে যুগ্ম), ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭২ (মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম), ১৯৭৩, ১৯৭৫, ১৯৮০ (মহমেডানের সঙ্গে যুগ্ম), ১৯৯০ ও ১৯৯১ সালে ডুরান্ড কাপ জয় করেছিলো।

ব্রাজিলের নয়া স্টার রোমারিও

অরুণাভ গুপ্ত

রিও ডি জেনেরিয়ো-তে খেলা। মারাকানা স্টেডিয়ামে এক চিলতে জায়গাও নেই। গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি করে বসে আছেন লাখের ওপর দর্শক। পাঁচ-দশ-পনের-বিশ মিনিট একঘণ্টা-দুঘণ্টা টিক্‌টিক টিক্‌টিক ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। বিতিকিচ্ছিরি অস্বস্তি। কখন খেলা শুরু হবে। শেষমেষ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। স্টেডিয়ামে ঢুকলো ব্রাজিল আর উরুগুয়ে। আজকের লড়াইতে স্থির হয়ে যাবে আগামী বিশ্বকাপের মূলপর্বে কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে। বলা বাহুল্য শতকরা নব্বই জনই ব্রাজিলের সাপোর্টার। টানটান উত্তেজনায় বুকের মধ্যে ড্রাম পিটছে ওদের। মনে পড়ছে, এই মারাকানা স্টেডিয়ামে ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের আসরে ব্রাজিল উরুগুয়ের কাছে হেরে বসেছিল। বড্ড দুঃখের দিন। সেই দিনটা আবার ফিরে আসবে না তো!! প্রতিটি সাপোর্টার নিঃশব্দে ইষ্টদেবতার নাম জপতে শুরু করে দিলেন। প্রার্থনা একটাই, 'হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের ছেলেগুলোকে শক্তি দাও, সাহস দাও। ওরা যেন ক্ষ্যাপা বাঘের মতো উরুগুয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের তছনছ করে দেয়।'

খেলা চলছে। দুর্দান্ত খেলছে ব্রাজিল। উরুগুয়ের পোস্টে লেগে বল ফিরে আসছে। অজস্র সহজ সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে। প্রথমার্ধে খেলার ফলাফল শূন্য-শূন্য। হায় কপাল! ভাগ্য কি এভাবেই ব্রাজিলকে বিট্রে করবে? টেনশন সমর্থকদের ঘাড়ের ওপর সিন্দবাদের মতন জেঁকে বসেছে। শুরু হলো দ্বিতীয়ার্ধের খেলা। ব্রাজিল শিকারী কুকুরের মতো গোলের সন্ধানে সারা মাঠ চষে বেড়াচ্ছে। পাক্কা ছাব্বিশ মিনিটের মাথায় বহু আকাংখিত প্রথম গোল এলো। ডিফেন্স থেকে বল বাড়ালেন বেবেতোর উদ্দেশে জর্জিনহো। বেবেতোর বল ধরে রাখার অভ্যেস নেই। তুরন্ত বল তুলে দিলেন গোলের মুখে। একটা মাথা লাফিয়ে উঠলো। ব্যস! কেল্লা ফতে। মারাকানা স্টেডিয়ামের চারপাশ থেকে আওয়াজ উঠলো গো-ও-ল। সাত রাজার ধন মানিক একখানা। ব্রাজিলিয়ানদের গলার আওয়াজ সপ্তমে চড়লো। ঐ আকাশ ফাটানো চিৎকারের মধ্যেই দশ মিনিট কাবার হতে না হতেই ফের গোল। চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় দুটো পা উরুগুয়ের গোলকিপার সিবোলভিকে কাটিয়ে নিয়ে বল জালে ঠেলে দিল। সীমাহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর বল্গাছেঁড়া আবেগে ব্রাজিলের সমর্থকরা কেঁদে ফেললেন। দস্যি দামাল ছেলেগুলো পেরেছে! কিন্তু কে দিল এই দুটো গোল? হিম্মতদারের নাম কি? নাম রোমারিও। এতদিন কোথায় ছিল এই হীরের টুকরো ছেলেটা? ছিল জায়গামতোই। কিন্তু তাঁকে তফাতে রেখে দিয়েছিলেন ব্রাজিলের কোচ কার্লোস পেরিরা নিজেই স্বয়ং। কারণ? অজ্ঞাত। মনে হয় ইগোর লড়াই। তাই ব্রাজিলের মাটিতে জার্মানীর সঙ্গে প্রীতি খেলায় রোমারিওকে হল্যান্ড থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসেও দ্বিতীয়ার্ধের আগে মাঠে নামানোর প্রয়োজন মনে করেননি। এমনকি জুনের শেষে স্টেটসে ইউ এস '৯৩ কাপ প্রতিযোগিতাতেও রোমারিওকে কার্লোস ডাকার দরকার বোধ করেননি। এবারের প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপেও কার্লোস পেরিরা দল থেকে স্রেফ ছেঁটে ফেলে দিয়েছিলেন রোমারিওকে। কিন্তু সমর্থক ও মিডিয়ার চাপের কাছে শেষমেষ কার্লোস মাথা নোয়াতে বাধ্য হন। শেষ ম্যাচে রোমারিও শুধু এলেনই না—খেললেন এবং জয়ও করলেন। গুনে গুনে দু-খানা গোল উরুগুয়েকে উপহার দিয়ে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ ফুটবলের মূলপর্বে নিয়ে গেলেন। আজ পর্যন্ত ব্রাজিল প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপে ছিট্‌কে যায়নি। এবারও তারা সেই রেকর্ড অমলিন রেখেছে। এতসব কাণ্ডের নায়ক সেই রোমারিও কি ধরনের ফুটবলার একটু বরং ঝালিয়ে দেখে নেওয়া যাক।

এই মুহূর্তে বহু আলোচিত রোমারিও বার্সিলোনা ক্লাবের হয়ে খেলছেন। তার আগে ভাস্কো-ডা-গামা ক্লাবে খেলার সময় তিনি ৭৩টি

ম্যাচ খেলার সুবাদে ঝড়ের গতিতে ১২৩টি গোল করেন। সিওল অলিম্পিক্সে সাত-সাতটা গোল দিয়ে রোমারিও শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন। পি এস ভি এনডোভেন-এ থাকাকালীন রোমারিও পাঁচ বছরে ১৯৮৯, '৯১ ও '৯২-তে ডাচ লিগ এবং ১৯৮৯ ও ১৯৯০-তে ডাচ কাপ করতলগত করেন ক্লাবের হয়ে। নিঃসন্দেহে রোমারিও ফুটবলের এক জাত শিল্পী। সেন্টার ফরোয়ার্ড রোমারিও প্রয়োগ কুশলতাতেই শুধু সিদ্ধহস্ত নন উপরন্তু প্লাস পয়েন্ট হিসাবে রয়েছে তাঁর স্বভাবজাত ফুটবল প্রতিভা। কি রকম? মানে কি কি গুণ দেখে রোমারিও-কে এতো বড়ো সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন ফুটবল-বোদ্ধারা?

(১) দুর্দান্ত বল কন্ট্রোলিং এবং অসাধারণ ড্রিবলিং। পায়ে বল আঠার মতন লেগে থাকে। আর ড্রিবলিং? প্রতিপক্ষের তিন-চারজন চোখে সর্ষেফুল দেখেন যখন রোমারিও তাঁদের ধোঁকা দিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যান।

(২) রোমারিওর শরীর—শরীর তো নয় যেন হারমোনিয়াম। আঙুল ছোঁয়ালেই সুর খেলতে শুরু করে। সেরকম রোমারিওর গোটা বডি ওঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। যেন মালিকের চাহিদা অনুযায়ী সবসময় কথা বলছে। শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে বল রিসিভ করে তা নিজের মনপসন্দ করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে রোমারিও পাক্কা ওস্তাদ।

(৩) রোমারিওর মাথাখানা স্রেফ যেন কম্পিউটার। বিশ্বের কোনো খেলোয়াড়ের মস্তিষ্ক এতো চটজলদি কাজ করে না। ধরে নিন জটলার মধ্যে গুঁতোগুঁতি-লাথালাথি চলছে। কেউই বলে দখল নিতে পারছেন না। রোমারিও সেখানেই মাস্টার-ব্রেন। তুরন্ত মাথা খাটিয়ে বল নিয়ে হাওয়া। অন্যেরা পরে মাথা চুলকে ভাবছেন—আরে তাজ্জব কি বাত! এটা তো আমরাও পারতাম। এই তাৎক্ষণিক ভাবা ও করাটাই রোমারিও নিমেষে সারেন।

(৪) মেপে জুপে' কাজের কাজটি করতে রোমারিও একমেবাদ্বিতীয়ম। খোলা ভাষায় যাকে বলে ক্যালকুলেশন মাস্টার। ধরুন রোমারিও বল পায়ে এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ দেখলেন বিপক্ষ দলের গোলকিপার একটু এগিয়ে এসেছে। রোমারিওর ক্যালকুলেশন তখন কি বলে? বলে, গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে বলটা টপকে দাও। গোল হওয়ার নাইনটি পার্সেন্ট চান্স রয়েছে। ব্যস! ক্যালকুলেশন যখন হয়ে গেছে আর এক পাও এগোনো নয়। রোমারিও ওখান থেকেই বল টপকে দিলেন। অর্থাৎ যখন যেটা দরকার সেটাই ঠাণ্ডা মাথায় করেন। বাড়তি মাথা ঘামানোর অহেতুক প্রয়োজন নেই। গতানুগতিকতার নাম-গন্ধ রোমারিওর মধ্যে নেই। ফলে বিপক্ষ সবসময় ধন্দে থাকে।

(৫) ব্রাজিলের আর একজন স্টার ফুটবলার হলেন বেবেতো। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রোমারিওর পার্থক্য হলো বেবেতো বল বেশিক্ষণ পায়ে রাখেন না। চটপট পাস দিয়ে দায়িত্ব খালাস করতে বেবেতো এক নম্বর। পাশাপাশি রোমারিও উল্টো। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ মানসিকতা নিয়ে রোমারিও একক প্রচেষ্টায় আক্রমণ অন্য খাতে বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

(৬) রোমারিও দু-পায়ের মাঝখানে বল রেখে এমন কায়দায় এগোন যে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের পক্ষে তা কেড়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে ফাউল করে গতি প্রতিহত করা ছাড়া বিকল্প নেই।

ডায়েরি রাখলে কি হয়?

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রীম তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন বলেই তো আমরা পেয়েছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।
- ডায়েরি দেখে অতীতের ঘটনার কথা বললে সকলেই তা বিশ্বাস করেন।
- নিয়মিত ডায়েরি লিখলে সাহিত্যিক হওয়া যায়।
- এখনকার ডায়েরি ভবিষ্যতে গল্প উপন্যাস লিখতে সাহায্য করে।
- ডায়েরি নষ্ট স্মৃতি পুনরুদ্ধার করে।
- নিজের অগ্রগতির সন্ধান ডায়েরির মাধ্যমেই পাওয়া যায়।
- রোজ ডায়েরি লিখলে একাগ্রতা বাড়ে।
- ব্যবসা সুশৃংখলভাবে চালাতে ডায়েরি লেখা নানাভাবে সাহায্য করে।
- ডায়েরি লিখলে ছোটদের ভাষার ওপর দখল এসে যায়
- ডায়েরি লেখার আরও অনেক সুফল আছে।

DEV'S DIARY 1994

এখন থেকেই সকলের ডায়েরি লেখার অভ্যাস করার দরকার। সেই জন্যেই আমরা খুব সুন্দর করে Dev's Diary 1994 তৈরি করেছি।

দেবসাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

(৭) পেনালটি বক্সের মধ্যে বল পেলে রোমারিও আর দ্বিতীয় চিন্তা মাথায় ঠাঁই দেন না। একাই গোল করেন। প্রয়োজনে গোলকিপারকে ধোঁকা দিয়ে সম্পূর্ণ বেসামাল অবস্থায় ফেলে। অথচ বহু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বিশেষ করে ব্রাজিলিয়ানরা পেনালটি বক্সের মধ্যে সাতটা-আটটা পাসে নিজেদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া করে গোলে শট নেন। অর্থাৎ পরিভাষায় যাকে বলে মেক সিওর অব ইট। কিন্তু এই নিশ্চিন্ত হওয়ার ব্যাপারটা রোমারিওর কুষ্ঠীতে নেই। কারণ রোমারিও টার্গেট করতে একেবারে অর্জুন।

(৮) প্রতিকূল পরিস্থিতি—সেখান থেকে পর্যন্ত রোমারিও বল বের করে নিয়ে আক্রমণ শানাতে ওস্তাদ বিশেষ। যা অন্য কোনো ফুটবলার কল্পনাতেও আনতে পারেন না।

(৯) তবে রোমারিওর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার বা দেখানোর একটা মানসিকতা রয়েছে। পরিভাষায় ইনডিভিজুয়াল এক্সপোজার। যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে টোট্যাল ফুটবলে বিপত্তি ঘটায়। অসুবিধার সৃষ্টি করে। তবে একক প্রয়াসে পজিটিভ কিছু করার ক্ষমতা রোমারিওর আছে। মানে ওঁকে মানায়। সবচেয়ে মজার কথা হলো রোমারিও সতীর্থকে পাস দিয়েই এমন পজিশনে চলে যান যেখানে ওঁকে বল ঠেলা ছাড়া বিকল্প থাকে না। সেক্ষেত্রে সবসময় মনে হয় বল রোমারিওর পায়েই রয়েছে।

(১০) ফাঁকা জায়গায় রোমারিওর কাছ থেকে বল ছিনিয়ে নেব এমন বুকের পাটা বিপক্ষের দু-তিনজন-ও চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারবেন না। আর ওয়ান ইজটু ওয়ান হলে? ফুঃ! চৌহদ্দির মধ্যে পা-চালানো অসম্ভব। স্রেফ তাঁকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন রোমারিও।

মোটেই আর পাঁচটা-দশটা ফুটবলারের মতন লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারার মালিক নন রোমারিও। বড় জোর পাঁচ ফুট প্লাস ইঞ্চি কয়েক। তাতে কি এসে যায়? এই মুহূর্তে ব্রাজিলের রোমারিও একাই একশো। শেষ খেলায় সুযোগ পেয়ে উরুগুয়েকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়ে রোমারিও এখন স্বদেশে সুপার-সুপার-সুপারহিট। দেওয়ালে দেওয়ালে ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। কোচ কার্লোস এখন ভিলেন, রোমারিওর বিরাশি সিক্কার পাঞ্চে এখন কুপোকাৎ। তবে আমাদের ফুটবল লাভার্সদের প্রার্থনা দু'জনেই শান্ত থাকুন। ইগো-টিগো শিকেয় তুলে ভাবুন শুধু আসন্ন বিশ্বকাপের কথা। পেলের দেশ ব্রাজিল ফুটবলের শিল্পী। সকারের শিল্প-সুষমা, মাধুর্য, ছলাকলা সব ওঁরা অকৃপণ মেজাজে আমাদের দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে বেঁধে ফেলেছেন। ব্রাজিলের কাছে আমাদেরও চাহিদার শেষ নেই। তাই আগামী বিশ্বকাপে প্রতিটি ভারতবাসী অধীর আগ্রহে ব্রাজিলকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে চায়। আর তা আসুক অনন্যসাধারণ ফুটবলার রোমারিওর হাত ধরে।

তোমাদের জিজ্ঞাসা

এ.সি. পাল (রবীন্দ্রপল্লী, বর্ধমান)

প্রশ্ন ঃ সুনীল গাভাসকারের ছেলে নাকি ক্রিকেট খেলে? কোন ক্লাবে খেলে সে?

উত্তর ঃ রোহন গাভাসকার কোনো ক্লাবে খেলে না। সে বয়েসও তার হয়নি। শোনা যায় ক্রিকেটের চেয়ে ফুটবলের দিকে তার বেশি ঝোঁক।

জয়ন্ত সিংহ চৌধুরী ও সুমন্ত সিংহ চৌধুরী (দশঘরা, হুগলি)

প্রশ্ন ঃ ভারতে কোন খেলা সবথেকে জনপ্রিয়?

উত্তর ঃ ফুটবল আর ক্রিকেট।

গৌতম দে (C/o, কিরীটীভূষণ দে, মিশনপাড়া, পোঃ আদরা, পুরুলিয়া)

উত্তর ঃ তোমার কথামতো পুজো সংখ্যায় আরও বেশি করে খেলার লেখা ও ছবি ছাপার চেষ্টা করা হবে।

শোভনজিৎ ভট্টাচার্য (আদিত্যপুর, জামশেদপুর)

প্রশ্ন ঃ আমি ভাস্কর গাঙ্গুলির ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর ঃ তুমি ওঁকে C/o, শুকতারা, ১১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা—৯ এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারো। আমরা পৌঁছে দেবো।

অনিন্দিতা সরকার (শিলিগুড়ি, দার্জিলিং)

প্রশ্ন ঃ শুকতারায় বরিস বেকার, স্টেফান এডবার্গ, আঁদ্রে আগাসি, স্টেফি গ্রাফের পোস্টার ও ঠিকানা চাই।

উত্তর ঃ পোস্টার তো ছাপা হয়েছে। স্টেফির পুরো পাতা রঙিন ছবি তো কয়েকমাস আগেই ছাপা হয়েছে। বেকারের বড় ছবিও ছাপা হয়েছে। অন্যদেরও হবে। ঠিকানা তো নেই।

অশোককুমার প্রধান (বাসুদেবপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া-৪)

উত্তর ঃ তোমার প্রশ্নের উত্তর তো আগেই ছাপা হয়েছে।

সুমন্ত মণ্ডল (বাগদা, উত্তর ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন ঃ আশিস ও কুমকুম মণ্ডল ও সুধীর পালের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর ঃ ওঁদের C/o, সিটি তাঁবু, ময়দান, কলকাতা-১ এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংযুক্তা ভৌমিক, ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য ও সৌমী বিশ্বাস (৩১/এ বিধান সরণী, কলকাতা-৬)

প্রশ্ন ঃ আমরা বোম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর ঃ C/o ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়াম, বোম্বাই।

সুমিতকুমার ঘোষ (কান্দী রাধাবাজার, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্ন ঃ কিরণ মোরের জন্মদিন কবে?

উত্তর ঃ ৯ সেপ্টেম্বর। জন্ম ১৯৬২ সালে।

দীপান্বিতা সরকার (গ্রাম সুরুল, পোঃ শ্রীনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম)

প্রশ্ন ঃ শচীন তেণ্ডুলকারের ছোটবেলার কথা জানতে চাই।

উত্তর ঃ শুকতারায় তো আগেই ছাপা হয়েছে।

সৌম্যজ্যোতি সাহা (C/o, বাদল সাহা, ওলাদেবীতলা, নবদ্বীপ, নদীয়া)

প্রশ্ন ঃ আজহারউদ্দিন, কপিলদেব, শচীন তেণ্ডুলকাররা কি ফ্যান লেটার পড়েন ও উত্তর দেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ পড়েন। উত্তরও দেন।

পড়ার সঙ্গে খেলা

কল্যাণ মৈত্র

লাভপুর যাদবলাল উচ্চ বিদ্যালয়

সেদিন রেজাল্ট বেরিয়েছে। হাতে মার্কসশীট নিয়ে ছেলেরা ফিরছে। কারোর মুখে হাসি, কারোর চোখে জল। সামনের একটি ছেলেকে ডেকে বললাম, কেমন হলো? —ভালো। নাম কি তোমার? —মহিবুল হুসেন। কোন ক্লাশ?—সেভেন। অঙ্কে কতো পেয়েছ? —পঞ্চাশ। এই স্কুলেই তো কথা-সাহিত্যিক তারাশংকর পড়েছেন, তাই না?—হ্যাঁ, ওই পাশের রাস্তার ভেতরেই তাঁর বাড়ি।

ভাবতে ভাল লাগল যে লাভপুরের যাদবলাল উচ্চ বিদ্যালয়েই তারাশংকর পড়েছেন। তারাশংকরের স্কুল আজ কত গর্বভরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। হুসেনকে ফের বললাম, কী কী খেল? সে বলল, খো-খো, কবাডি, ফুটবল আর চোর-চোর! ওর এই অদ্ভুত উত্তরে অবাক হয়ে বলি, স্কুলে চোর-চোর? —হ্যাঁ। টিফিনের সময় খেলি।—ও তাই বলো!

লাভপুর স্টেশনের খুব কাছেই স্কুল। বীরভূম জেলার এই স্কুলটির নাম আছে। স্কুলের পাশ দিয়েই চলে গেছে ছোট রেল। ট্রেনে চেপে গেলে দূর থেকেই হলুদ-লাল রং মেশান স্কুলবাড়িটা চোখে পড়ে। গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা তবে চারপাশে কোনো পাঁচিল নেই। স্কুলের পেছনে ধু-ধু মাঠ।

সিলেবাস এক হলেও পড়ার পরিবেশ গ্রাম আর শহরে দু-রকম। গ্রামের পরিবেশ অনেক খোলামেলা। পড়াশুনোর ব্যাপারে কঠোর ভাব তেমন নেই। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের চিত্র আরও অন্য রকম। শহরের স্কুলে ছেলেমেয়েরা রিকশায় চেপে, টিফিন নিয়ে, কাঁধে ওয়াটার বোতল ঝুলিয়ে স্কুলে যায়। আর গ্রামের বুকে এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে ছেলেমেয়েরা বসার জন্য চটের আসন বগলে নিয়ে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে স্কুলে যায়। এখন অবশ্য বাস হয়েছে। কিছু সুবিধা হচ্ছে। গ্রামের স্কুলে যারা পড়ে তারা মূলত চাষী পরিবারের ছেলেমেয়ে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তারা স্কুল কামাই করে চাষের কাজ করে। যাদবলাল স্কুলের এক শিক্ষক মহাশয় এই অভিযোগ করেছেন। তা হলেও গ্রামের ছেলেমেয়েরা বরাবরই ভালো রেজাল্ট করে। প্রকৃতির সঙ্গে মেশার সুযোগ তাদের প্রচুর। শুধুমাত্র শহরের অতিরিক্ত সুবিধাটুকু থেকে তারা বঞ্চিত।

যাদবলাল স্কুলে ঢুকতেই চোখে পড়ল বাঁ দিকে একটা ভলিবল কোর্ট। বহু পুরানো এই স্কুল। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা, আর কিছুদিন পরই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। কত স্মৃতি কত ঐতিহ্য গায়ে

লেগে। ১৯৫৭ সালে এগার ক্লাশ, আর '৭৬ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক কোর্স চালু হয়। ১১০০ ছাত্র বর্তমানে পড়ে। প্রধান শিক্ষকমশায় দেবীশংকর ভট্টাচার্য বললেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন যে খেলাধূলার দিকে ছাত্রছাত্রীদের আরও উৎসাহ দেওয়া উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা একান্ত জরুরী। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন যে গ্রামের ছেলেরা ভাল কোচিং পাচ্ছে না। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের শেখাবারও কেউ নেই। আজ বিশ্বের খেলাধূলার জগতে ভারত কত পেছনে! গ্রামের স্কুলগুলি বড়ই অবহেলিত।

স্কুলের গেমস-টিচার দুর্গাপদ চৌধুরী বললেন, যাদবলাল স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষায় যেমন স্টার পায় তেমনি জেলার মধ্যে খেলাধূলায়ও নাম করেছে। সাব-ডিভিশনে গত বছর জয়ী হলেও স্কুল জেলাস্তর ফুটবলে হেরে যায়। তবে ভলিবলে জেলা চ্যাম্পিয়ান। কবাডিও স্কুলের ছাত্ররা ভাল খেলছে। শীতের সময় ক্রিকেট প্র্যাকটিশ তো আছেই। বর্তমানে তেজারৎ হুসেন, প্রদ্যোৎ মজুমদার, বিশ্বনাথ সরকার, সুখেন্দু ভট্টাচার্য কবাডির সেরা খেলোয়াড়। প্রবীণকুমার সাহা, সৌগত আচার্য ফুটবলে নাম করেছে। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তুষারকান্তি গড়াই হাইজ্যাম্পে পরপর তিনবার জেলাস্তরে প্রথম হয়েছে। রাজ্যস্তরে সে আজও কোনো সুযোগ পেল না কেন? ক্লাশ এইটের ছাত্র সৌরভ ত্রিবেদী মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করবে বলে শিক্ষকরা আশা করছেন। সৌরভ খুব ভাল ক্রিকেট খেলে।

কিছুদিন আগে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। ছাত্রদের তিনি নানা বিভাগে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করেন। যাদবলাল স্কুলের পত্রিকা 'প্রদীপ' বেশ ভালো লাগল। ছাত্ররা নিয়মিত লেখে। কয়েকটি লেখা উন্নত মানের। শিক্ষকরাও ছাত্রদের লিখতে উৎসাহ দেন।

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

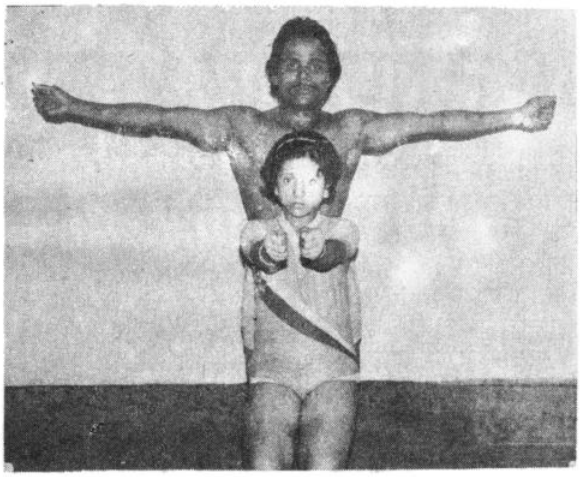

ছবি ১

গ্রুপ এক্সাসাইজ

সুস্থ থাকার সহজ সরল উপায় শরীরচর্চা করা। কিন্তু শরীরচর্চা বড় একঘেয়ে জিনিস তাই তার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনলে কিছুটা একঘেয়েমি দূর হবে। তবে নিয়মিত করলে আমরা শরীরচর্চার দাস হবো তখন আর বিন্দুমাত্র একঘেয়েমি থাকবে না। আবার কয়েকজনে মিলে এক সঙ্গে শরীরচর্চা করলে একটা প্রতিযোগিতামূলক ভাব আসবে। শরীরচর্চার সঙ্গী ভাই বোনে হতে পারে, বাবা-মাও হতে পারেন, বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে করতে পার। আমাদের ব্যায়ামের পরিভাষায় অপরের সঙ্গে করাকে বলি ট্রেনিং পার্টনার। এতে একঘেয়েমি দূর হবে আর ব্যায়ামেও আসরে বৈচিত্র্য।

বজ্রাসনে চেস্ট কনট্রাকশান (ছবি ১)

নীল ডাউন হয়ে বা বজ্রাসনে বসো, অর্থাৎ পা ভাঁজ করে পায়ের পাতার উপর নিতম্ব রাখো। এবার তোমার ট্রেনিং পার্টনার ছবির মেয়েটির মতো হাত দুটিকে তুলে মাটির সমান্তরালে নিয়ে আসবে। শ্বাস নিতে নিতে দু'হাত পিছনে নিয়ে যাও, পরমুহূর্তেই

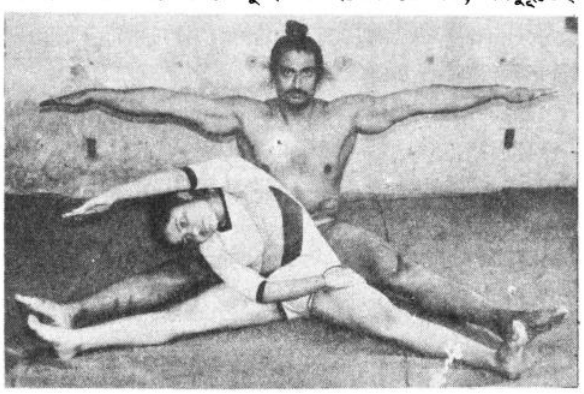

ছবি ২

শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আবার সামনে নিয়ে এসো। দু দিক মিলে একবার হলো। মুখোমুখি বসে এই ব্যায়ামটি করো। দাঁড়িয়েও করতে পারো। হৃদ্‌যন্ত্রের ও ফুসফুসের কাজ ভাল হয়। ব্যায়াম আরম্ভ করার আগে শরীরটাকে গরম করে নিতে হয়। এই ব্যায়ামে সেই কাজটা হয়।

বিভক্তাসনে সাইড বেন্ডিং (ছবি ২)

এই ব্যায়ামটিও মুখোমুখি বসেই করবে তবে ঠিকমতো বোঝাতে ছবিটা এইভাবে দেওয়া হয়েছে। ছবির পিছনের পুরুষটির মতো বসো। পরে শ্বাস নিতে নিতে সামনের মেয়েটির ভঙ্গিমায় চলে আসবে, পরমুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পিছনের পুরুষটির ভঙ্গিমায় অর্থাৎ প্রথম অবস্থানে চলে যাও। প্রথমে ডান দিকে বাঁকলে

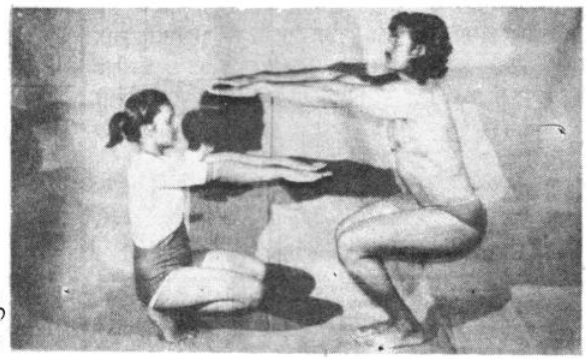

ছবি ৩

পরে একই ভাবে বাঁ দিকেও করো। দু'দিকে মিলে একবার হলো। কোমর ও ডেলটয়েডের পেশীসমূহ গরম হয়। ওইসব অঞ্চলের অতিরিক্ত মেদও দূর হয়ে যাবে। কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্বল প্রভৃতি রোগ সারবে।

উৎকটাসন ও স্কোয়াট (ছবি ৩)

ছবির পুরুষটির ভঙ্গিমায় এসো, না পারলে মেয়েটির ভঙ্গিমায় আসবে। খেয়াল রাখবে পায়ের উরুদ্বয় ও হাত যেন মাটির সমান্তরাল থাকে। যে যে অবস্থানে থাকবে সে সেই অবস্থানে থাকো ১০/১৫ সেকেন্ড বা তোমার সাধ্য মতো। এটি হলো উৎকটাসন। ব্যায়ামটি আরেক ভাবেও করতে পার। হাত দুটি প্রথমে মাটির সমান্তরাল তুলে দাঁড়াও। এখন শ্বাস নিতে নিতে বসতে থাক এবং চলে এস মেয়েটির ভঙ্গিমায়। পরমুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে কিন্তু হাত নামাবে না। একবার হলো। প্রতি মাত্রায় ১০/১৫ বার বা তোমার সাধ্য মতো করো। পায়ের পেশীর জোর বাড়বে, পেশীর গঠন সুন্দর হবে, অতিরিক্ত মেদও দূর হয়ে যাবে। হাঁটুর বাতজনিত ব্যথাও থাকবে না। এই আসন অবস্থানে কে কতক্ষণ থাকতে পারো বা কে কত বার ওঠ বস করতে পারো দুজনে মিলে করলে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব আসবে।

(বাকি ব্যায়াম আগামী সংখ্যায়)

ভাল কাজের ফল পাবেই

অসীম চৌধুরী

গাইল্‌স আর বেটি দুই ভাই-বোন। খুব ভাব দুজনের। স্কুল থেকে ফিরে হোমওয়ার্ক শেষ করে সমুদ্রের তীরে বেড়াতে কিংবা জলের কাছাকাছি হুটোপুটি করতে খুব ভালবাসে তারা। তারপর সমুদ্রের বালি দিয়ে দুর্গ গড়া বা বালি খুঁড়ে নদী বানানো তো আরও মজার। একঘেয়ে লাগলে ভাই বোনে মিলে ঝিনুক কুড়োয়।

একদিন ওরা বিকেলে সমুদ্রের তীরে খেলতে গেছে। সেদিন প্রকৃতি খুব শান্ত নয়। আকাশ ধূসরবর্ণ, সমুদ্রের জলও নীল নয়। বিরাট বিরাট ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে পড়ছে। তীরে শুধু ওরাই দুজন, কাছে পিঠে কেউ নেই। হঠাৎ দেখতে পেলো কালো কুকুরটা আসছে। প্রকাণ্ড বড়, ঠিক যেন বাঘের মতো। স্বভাবটাও খুব বদ। মানুষজন দেখলেই তেড়ে যায়। কুকুরটাকে গাইল্‌স আর বেটির ভীষণ ভয় করে।

কুকুরটাকে দেখেই বেটি দাদার পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, দাদা, কুকুরটা আমাদের দিকে আসছে। সেদিন আমাকে দেখে তেড়ে এসে কামড়াতে যাচ্ছিল।

গাইল্‌স বলল, চল আমরা ওই বাঁশের মাচাটায় দাঁড়াই। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের গর্জন শুনবো আর বিরাট বিরাট ঢেউ দেখবো। দেখ দেখ, কি সুন্দর ফেনা আর ঢেউ।

ঠিক এই সময় বেটির চোখে পড়লো কি যেন একটা তীরে এসে পড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বেটি বলল, দাদা দেখ দেখ, কালো মতন ওটা কী? নিশ্চয়ই একটা বড় পাখি।

গাইল্‌স কাছে গিয়ে বলল, তাইতো একটা পাখি। নড়ছে রে, নিশ্চয়ই মরেনি বেঁচে আছে।

ওরা দুজনে জলের ধার থেকে পাখিটাকে শুকনো বালির ওপর তুলে আনলো।

গাইল্‌স বলল, শঙ্খচিল। ভাগ্যিস তুলে আনলাম, নইলে নির্ঘাত জলে ডুবে মারা যেতো। গাইল্‌স শঙ্খচিলটার পা ধরে

তুলে বেটির সামনে ধরলো।

শঙ্খচিলটা ক্লান্ত শ্রান্ত অর্ধনিমীলিত চোখে ওদের দিকে তাকাল। দুই চোখে কৃতজ্ঞতার ছাপ। এত ক্লান্ত যে একটুও নড়তে পারছে না।

দেখ দেখ দাদা, পাখিটার ডানা আর গায়ের পালকে ঘন তেল চপচপ করছে। মনে হচ্ছে জাহাজের তেলের মধ্যে বেচারী পড়ে গিয়েছিল। তাই না পারছে উড়তে, না সাঁতরাতে। এখন এটাকে নিয়ে কি করি বল তো?

চল, মার কাছে নিয়ে যাই। মা জানেন কি করতে হবে। দুই ভাই-বোনে তেল চপচপে মৃতপ্রায় শঙ্খচিলটাকে চ্যাংদোলা করে মার কাছে নিয়ে এলো।

গাইল্‌স আর বেটির হাতে শঙ্খচিল দেখে ওদের মা প্রথমটায় আঁতকে উঠেছিলেন। তারপর শঙ্খচিলটার গায়ের পালক, ডানাময় তেল দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, আহারে, সর্বাঙ্গে এত ঘন তেল মাখামাখি হলে বেচারী উড়বে কেমন করে! ওকে গুদাম ঘরে নিয়ে চল। দেখি পেট্রল দিয়ে তেলগুলো তোলা যায় কিনা।

মা আর দুই ভাই-বোনে ক্যানে যতটা পেট্রল ছিল তাই দিয়ে ঘষে ঘষে শঙ্খচিলটার পালক থেকে যতটা পারলো তেল তুলে দিলো। কিন্তু চিলটা এত দুর্বল যে চুপ করে ঘাড় গুঁজে শুয়ে রইল। পরিশ্রান্ত হবে না? প্রাণ বাঁচানোর জন্য সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে কম লড়াই করেছে সে!

বেটি খড় আর গাছের পাতা একটা বাক্সে যত্ন করে সাজিয়ে চিলটার শোবার ব্যবস্থা করে দিলো। গাইল্‌স বাজার থেকে ছোট ছোট মাছ নিয়ে এলো ওর খাবার জন্য।

মা বললেন, আজ ওকে বিশ্রাম করতে দাও। খাবার তো দিয়েছো, ক্ষিদে পেলে ঠিক খেয়ে নেবে। মনে হয় সকালের দিকে চাঙ্গা হয়ে যাবে।

ভাই-বোনে গুদামের দরজা বন্ধ করে পড়তে বসে গেল। শঙ্খচিলের দুঃখের কথা ভেবে সারারাত ঘুমতে পারলো না তারা। পরের দিন রবিবার, স্কুল নেই। সকাল হতেই গাইল্‌স আর বেটি গুদাম ঘরে শঙ্খচিল কেমন আছে দেখতে ছুটলো।

দেখলো শঙ্খচিল কিছু মাছ খেয়েছে, একটু নড়ছে চড়ছে। সেই সঙ্গে ঠোঁটের আগা দিয়ে পালকের তেল ওঠাবার চেষ্টা করছে। গাইল্‌স খুব খুশি। বেটিকে বলল, বেঁচে আছে রে!

বেটি শঙ্খচিলকে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছো? শঙ্খচিল পিটপিট করে ওদের দিকে তাকালো। ভাবখানা এই—তোমরা জল থেকে তুলে না আনলে আমি মরেই যেতাম।

যাই হোক ওরা মাকে নিয়ে যতটা পারলো চর্বি আর পেট্রল দিয়ে ডানা ও পালকের তেল তুলে দিলো। শঙ্খচিলও ওর ছুঁচলো ঠোঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলো। মা বললেন, চর্বি পেটে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না। বিকেলেই দেখিস পাখিটা নিজেই বাকী তেলটুকু পরিষ্কার করে ফেলেছে। ব্যস, আর উড়তে অসুবিধে হবে না।

আরও দু-দুটো দিন শঙ্খচিল ওদের অতিথি হয়ে রইলো। শঙ্খচিলের সঙ্গে সঙ্গে গাইলস্‌ আর বেটিও ওর গা থেকে ঘষে ঘষে তেল ওঠাতে লাগলো। শঙ্খচিল এখন আর ওদের দেখলে ভয় পায় না। ওরা কাছে এলেই গলা দিয়ে মজার এক শব্দ করে অভ্যর্থনা জানায়।

চারদিন পর গাইল্‌স আর বেটি ধরাধরি করে শঙ্খচিলকে বাইরে উঠোনে আনতেই আর একটা শঙ্খচিলকে দেখে সে সুন্দর ডানা দুটো খুলে সোঁ করে নীল আকাশে উড়ে গেলো। শঙ্খচিল উড়ে যেতেই ওরা আনন্দে অধীর হয়ে হাততালি দিয়ে বলল, ওমা মা—পাখিটা ভাল হয়ে আকাশে উড়ে গেছে। ওই দেখো অন্য একটা চিলের সঙ্গে উড়ছে। ওদের বাড়িতে নিশ্চয়ই ওরা যাবে। মাকে দেখে খুব খুশি হবে।

দিন যায় দিন আসে। গাইল্‌স আর বেটি মনে মনে আশা করেছিল শঙ্খচিল আবার আসবে, ওদের সঙ্গে খেলবে। কিন্তু কোথায়? মা বললেন, আসবে না। পাখি কখনও পোষ মানে? কিন্তু একদিন সত্যিই এলো সে।

ওরা রোজই খেলার জন্য সমুদ্রতীরে যায়। হাতে থাকে বালি খোঁড়ার জন্য বাগানের কোদাল। দুজনেই বালি খুঁড়ছে হঠাৎ কোথা থেকে সেই বাঘের মতো কুকুরটা এসে বেটিকে তাড়া করলো। বেটি চেঁচাতে লাগলো। ও যত চেঁচায় পাজি কুকুরটা তত দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যায়। গাইল্‌স কোদালটা তুলে কুকুরটাকে মারতে গেলো। কুকুরটা একটুও ভয় পেলো না। উপরন্তু বিশ্রীভাবে চিৎকার করতে করতে গাইল্‌সকে তাড়া করলো।

ঠিক সেই সময় আকাশ থেকে ঝুপ করে কি যেন পড়লো। গাইল্‌স দেখলো একটা শঙ্খচিল। চিলটা অদ্ভুত এক স্বর তুলে কালো কুকুরটাকে তাড়া করলো। ওর ছুঁচলো লম্বা ঠোঁট দিয়ে কুকুরটার গায়ে মাথায় ল্যাজে ভীষণভাবে ঠোকরাতে লাগলো। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কুকুরটা ল্যাজ গুটিয়ে দে দৌড়। চিলও পিছু পিছু তাড়া করলো। একেবারে চোখের আড়াল করে তবেই ফিরলো সে। তারপর আকাশে উঠে ওদের ঘিরে পাক খেতে লাগলো।

গাইল্‌স হাততালি দিয়ে বলল, ওই, ওই যে আমাদের শঙ্খচিল। ও না এলে কুকুরটা আমাদের কামড়ে দিতো।

বাড়ি গিয়ে গাইল্‌স আর বেটি মাকে ঘটনাটা বলল। মা শুনে বললেন, শোনো, ভাল কাজ করলে তার ফল পাওয়া যায় বৈকি।

[ইনেড ব্লাইটন-এর 'ওয়ান গুড টার্ন ডিসার্ভস অ্যানাদার' অবলম্বনে]

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ

১। সংনামী বিদ্রোহ কোন মোঘল সম্রাটের আমলে হয়?
২। আরাবল্লী পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি?
৩। কাচের পাত্র প্রথম কোথায় তৈরি হয়?
৪। পীরেনিজ পর্বতের উঁচুতে স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছোট্ট রাজ্যটির নাম কি?
৫। চায়ে কোন এ্যাসিড থাকে?
৬। কার্পাস, রেশম, শণ ও পশমের মধ্যে কোনগুলো উদ্ভিজ্জ উপাদান থেকে প্রস্তুত হয়?
৭। 'ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার কর্তব্য আমি করেছি'। জীবনের পরিসমাপ্তিতে কোন নৌ-সেনানায়ক এই উক্তিটি করেন?
৮। অর্জুনের পত্নী দ্রৌপদী, উলুপী, সুভদ্রা ও চিত্রাঙ্গদার পুত্রদের নাম কি?
৯। মিলিটারি ট্যাঙ্কের এই নাম হলো কেন?

উত্তর ঃ

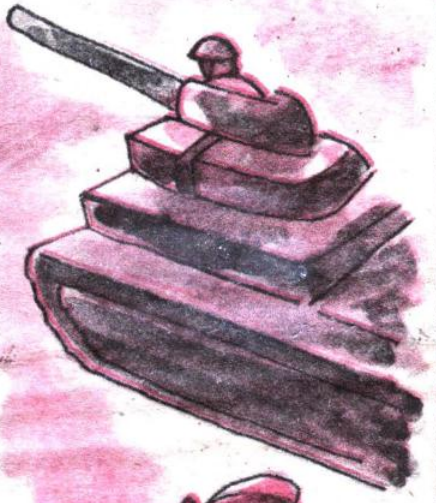

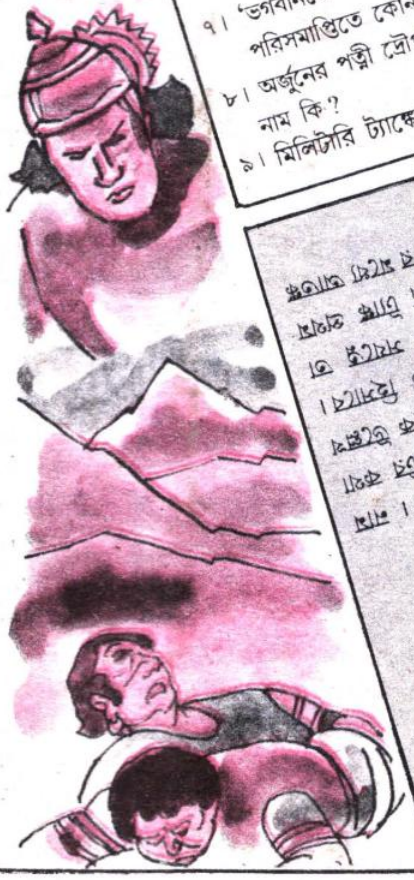

১। ঔরঙ্গজেব।
২। গুরু শিখর (১,৭৭২ মি.)
৩। মিশরে খ্রীস্টপূর্ব ১৪০০ সালে।
৪। আন্ডোরা।
৫। ট্যানিক।
৬। কার্পাস ও শণ।
৭। ইংলন্ডের লর্ড নেলসন।
৮। শ্রুতকর্মা, ইলাবন্ত, অভিমন্যু ও বভ্রুবাহন।
৯। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ট্যাঙ্ক তৈরি হয় ব্রিটেনে। নাম দেওয়া হয় 'ল্যান্ডশিপ'। কিন্তু নতুন এই অস্ত্রটির কথা গোপন রাখতে সব সরকারি আদানপ্রদানে একে উল্লেখ করা হতো ট্যাঙ্ক অর্থাৎ জল বইবার গাড়ি হিসাবে। প্রচুর লোক অস্ত্রটির কথা জানলেও এত সযত্নে তা গোপন রাখা হয় যে ১৯১৬ সালে যুদ্ধে ট্যাঙ্ক প্রথম ব্যবহার করা হলে অস্ত্রটি জার্মান সৈনিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়।

ছবিঃ সুফি

নির্মল সাহা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

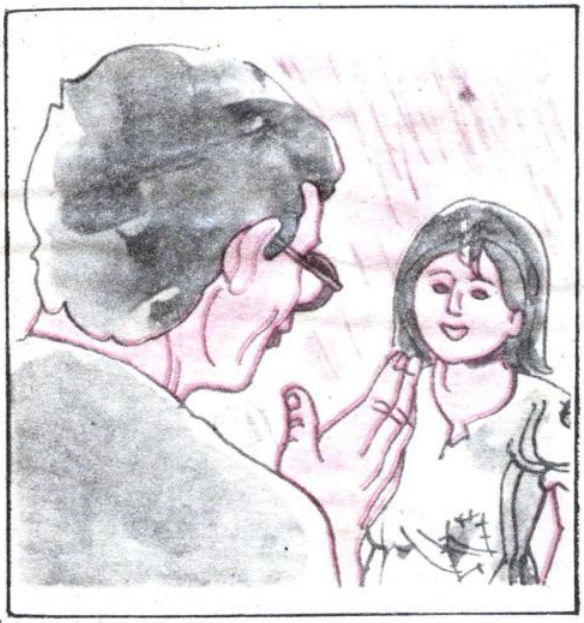

শ্রাবণ সন্ধ্যায়

দীনবন্ধু বসু

অমিয়বাবু কলকাতার একটি সওদাগরী অফিসের সামান্য মাইনের কর্মচারী। চাকরির সময় দশটা ছটা হলেও সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটার আগে কোনোদিনই অফিস থেকে বেরোতে পারেন না। হয়তো সাড়ে ছটা নাগাদ হাতের কাজ শেষ করে সবেমাত্র উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় বড়বাবু এসে বললেন, 'একি অমিয়বাবু, চললেন নাকি? এই আর্জেন্ট চিঠিটা টাইপ করে দিয়ে যান। কাল সকালের ডাকেই পাঠাতে হবে।' অগত্যা আবার টাইপ করতে বসতে হয় অমিয়বাবুকে। এ তো রোজের ব্যাপার।

আজ বিকেল থেকেই মেঘ করেছে দেখে তিনি ভেবেছিলেন যে করেই হোক একটু তাড়াতাড়ি বেরোবার চেষ্টা করবেন। কেননা, তাঁর অফিস যে অঞ্চলে অর্থাৎ ক্যামাক স্ট্রীট এলাকায় সেখানে একটু বৃষ্টি হলেই এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায়। তখন সেই এক হাঁটু জল ঠেলে ঠেলে রাস্তা চলা এক দুরূহ ব্যাপার। তার ওপর রাস্তার ম্যানহোলগুলো তো হাঁ করেই আছে। একবার পড়লে আর রক্ষা নেই।

কিছুতেই তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বের হতে পারলেন না অমিয়বাবু। হাতের কাজ সামলে যখন রাস্তায় নামলেন তখন দেখতে পেলেন সামনে অথৈ জল। তিনি অফিসে বসেই দেখেছিলেন বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। আর তাতেই এই অবস্থা। এখনও বৃষ্টি পড়ছে সামান্য। তিনি ছাতাটা মেলে ধরলেন। সন্ধ্যেও হয়ে গেছে। রাস্তাটা বড় নিঃঝুম লাগছে। কেবল অফিস-ফেরতা দু-একজন চলেছেন তাঁরই মতো। রিকশা চলছে কয়েকটা। এই অন্ধকারে ম্যানহোলগুলো বাঁচিয়ে পথ চলাই মুশকিল। একটা যে রিকশা নেবেন সে সামর্থ্যও নেই। এক্ষুণি হয়তো রিকশাওলা সাত-আট টাকা চেয়ে বসবে। অগত্যা সাবধানে এগোতে থাকেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ ছায়ার মতো উদয় হলো একটি বাচ্চা মেয়ে। আবছা অন্ধকারে মুখ দেখতে না পেলেও তাঁর যতদূর মনে হলো বছর সাত-আট বয়স হবে তার। মেয়েটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আপনাকে জল পার করে দেব বাবু?' সঙ্গে সঙ্গে অমিয়বাবুর মনে পড়ল কয়েকদিন আগে কাগজে পড়েছিলেন বটে কলকাতায় এইরকম বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সামান্য টাকার বিনিময়ে যাত্রীদের জলমগ্ন রাস্তা নিরাপদে পার করিয়ে দিচ্ছে। এদের পারিশ্রমিক রিকশাভাড়ার চেয়ে অনেক কম হওয়ায় রাস্তা পার হতে লোকে এদেরই সাহায্য নিচ্ছে। ফলে রিকশাওলাদের মাথায় হাত। কাগজে একটি বাচ্চা মেয়ের রাস্তা পারাপার করার ছবিও দেখেছিলেন।

মেয়েটির আকুল কণ্ঠে সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি।—'চলুন না বাবু, আমি নিয়ে যাব।'

'কত নিবি?'

'মাত্তর এক টাকা বাবু।' উত্তর দিল মেয়েটি।

অমিয়বাবু রাজী হয়ে গেলেন। মেয়েটি হাত ধরে সাবধানে তাঁকে নিয়ে যেতে লাগল।

তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় থাকিস?'

'হোই সামনের ফুটপাতে গো।'

'তোর আর কে কে আছে?'

মেয়েটি বলতে লাগল, 'শুধু মা আছে গো বাবু। আজ কদিন ধরেই মায়ের খুব অসুখ তো, কাজ করতে পারে না। তাই আমি কোনোমতে যা পাই তাতেই চলে।'

'কিন্তু এভাবে তো আর রোজ পয়সা পাস না। তখন?' অমিয়বাবুর কণ্ঠে সহানুভূতি ঝরে পড়ে।

'কোনো কোনো দিন না খেয়েই কেটে যায়।'

অমিয়বাবু ভাবতে লাগলেন, আমি যখন সামান্য বৃষ্টিতেও আমার ছেলেমেয়েকে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে বাইরে বের হতে দিই না, তাদেরই বয়সী এই মেয়েটি তখন দুটো পয়সার জন্য রাত্রের অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে জলকাদার মধ্যে দিয়ে যাত্রী পারাপার

করে চলেছে। সত্যি, কি কষ্টের এদের জীবন!

বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট জলে ডুবে যাওয়ার জন্য একটু আগেই তিনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছিলেন। কিন্তু এখন ভাবলেন বৃষ্টিতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছিল বলেই না মেয়েটি দুটো পয়সা রোজগার করছে। আপনা থেকেই তাঁর মনের মধ্যের বিরক্তিটা কেটে যায়।

'এসে গেছি গো বাবু', মেয়েটির কথায় হুঁশ ফিরে পেয়ে তিনি দেখলেন মেয়েটির হাত ধরে পরম নিশ্চিন্তে কখন যে নিরাপদে এতখানি জল পেরিয়ে এসেছেন তা খেয়ালই করেননি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে অমিয়বাবু কি মনে করে পাঁচ টাকার একটা নোট মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন, 'যা, বাকীটা আর ফেরৎ দিতে হবে না।'

মেয়েটি অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

ছবি : সুফি

নির্মল সাহা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

বৃষ্টিঝরা দিনে

মহুয়া সাহা

সকাল থেকেই ঘন কাজলরঙা মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ, সেই সঙ্গে অবিরাম বর্ষণ। ভোরের সূর্য মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। সারা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বজবজ একটি জনবহুল মফস্বল এলাকা। অনিলবাবু তাঁর স্ত্রী রমা দেবী ও দশ বছরের মেয়ে রিমাকে নিয়ে প্রায় চোদ্দ বছর ধরে এখানে আছেন। রিমা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। প্রবল বর্ষণের জন্য আজ সে স্কুলে যেতে পারেনি। তাই মনে একটা ছুটি ছুটি আনন্দের হাওয়া লেগেছে। ঝরঝর বৃষ্টি দেখবে বলে রিমা জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। দেখে, তাদের বাড়ির পিছনে সবুজ মাঠটা জলে থইথই করছে। কাছেই একটা পুকুর কানায় কানায় ভর্তি। রিমাদের প্রতিবেশী সত্য কাকু, বিজন কাকু ছাতা মাথায় দিয়ে গামবুট পরে পুকুর থেকে কুচো চিংড়ি ধরতে লেগে গিয়েছেন। ভারি মজা লাগল রিমার এই সব দেখে। এক দৌড়ে চলে এলো সামনের বারান্দায় বৃষ্টির জল হাত বাড়িয়ে ছোঁবে বলে।

সামনের বারান্দায় এসেই কিন্তু রিমা থমকে দাঁড়াল। দেখতে পেল বড় রাস্তার ওপারে যে দু ঘর ভিনদেশী ফেরিওলা পরিবার ঝুপড়ি বানিয়ে বাস করত তাদের ঘরের মধ্যে জল ঢুকে গেছে। রাস্তাঘাটেও প্রচুর জল। ফেরিওলারা জল মাথায় করেই বেরিয়েছে রোজগার করতে। তাদের বৌ-বাচ্চারা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য একটা বড় বাড়ির বারান্দার নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের জন্য রিমার মনটা দুঃখে ভরে উঠল।

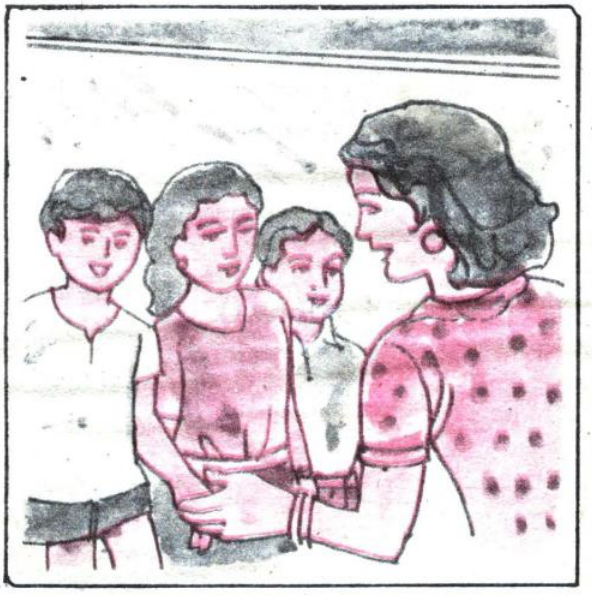

মুখোপাধ্যায় • মান্না • দত্ত
উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান
(হায়ার সেকেন্ডারী • জয়েন্ট এন্ট্রান্স • সর্বভারতীয় বায়োলজী পরীক্ষার্থীদের জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ)

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
(প্রশ্নোত্তরে)
সংসদের নমুনা প্রশ্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত নমুনা কপি না পেয়ে থাকলে সরাসরি লিখুন

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

এমন সময় হৈ হৈ করে ঘরে এসে ঢুকল রিমার বন্ধু রিয়া, বুলবুল, গৌতম, টুটুল ও সানি। উচ্ছ্বসিত স্বরে টুটুল রিমাকে বলল, 'জানিস রিমা, আমরা ঠিক করেছি আজ পিকনিক করব।'

অনুৎসাহিত কণ্ঠে রিমা বলল, 'কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় হবে পিকনিক?'

বুলবুল বলল, 'কেন, আমাদের ছাদের চিলেকোঠার ঘরে।' গৌতম পরামর্শ দিল খিচুড়ি আর ডিমভাজা রান্না হবে। এবার হাসি ফুটল রিমার মুখে। সে বন্ধুদের খুলে বলল দুঃস্থ অসহায় পরিবার দুটির কথা। সবাই তখন বাড়ি থেকে বেশি করে চাল ডাল নিয়ে এল। বাড়ির বড়দের সাহায্যে ও পাঁচ বন্ধুর আন্তরিক উৎসাহে বুলবুলদের বাড়ির চিলেকোঠায় বেলা বারোটা নাগাদ রান্না সমাপ্ত হলো।

তখনো ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। হাত ধরাধরি করে পাঁচ বন্ধু সেই বৃষ্টিতে ভিজে স্নান করল। বৃষ্টিতে ভেজার জন্য বড়রা সেদিন আর তাদের বকাবকি করলেন না।

এরপর খাওয়ার পালা। সেই দুটি ফেরিওলা পরিবারের সবাইকে খেতে ডাকতে গেল বন্ধুর দল। তারা তো প্রথমে খুব অবাক হয়ে গেল। বিশ্বাসই করতে চাইছিল না তাদের কথা। শেষে বারবার অনুরোধ করতে খুব ভয়ে ভয়ে তারা এল। বুলবুলদের টানা বারান্দায় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ির বড়রা পরিবেশন আরম্ভ করলেন। এবার ক্ষুধার্ত মুখগুলিতে হাসি ফুটল। সেই হাসির শুভ্রতায় রিমার মন আনন্দে ভরে উঠল। একটি বৃষ্টিঝরা দিন সোনা হয়ে ঝরে পড়ল তার কাছে।

ছবি: সৃফি

এঁদের লেখাও ভালো:

বিশ্বামিত্র রাজ (রায়নগর, ডায়মন্ডহারবার)॥ রঞ্জনা সিনহা (কটক, উড়িষ্যা)॥ রুমা ভট্টাচার্য (ঠাকুরপাড়া রোড, নৈহাটি)॥ এলা নাগ (দেশবন্ধুনগর, মেদিনীপুর)॥ বিপ্লব পাল (খাগড়া, বহরমপুর)॥ অর্ঘ্য চ্যাটার্জী (নগাঁও, অসম)॥

ঘোষণা

আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের সত্ত্বাধিকারী সঞ্জয় সাহা তাঁর প্রয়াত পিতা নির্মল সাহার স্মরণে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাবমতো নির্মল সাহা সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু:
শীতের রাতে

নির্মল সাহা
জন্ম: ৩ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৪৬
মৃত্যু: ১৬ ভাদ্র, শনিবার ১৩৮৫

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ মাঘ। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হবে।
প্রথম পুরস্কার: ১০০ টাকা; দ্বিতীয় পুরস্কার: ৫০ টাকা।

সৌজন্যে: আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়
(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) গড়িয়াহাট জংশন
১৬১ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৭০০০১৯

সত্যি !

এও কি সম্ভব

বাবা-মা ও তিন ছেলে-মেয়ে সকলেরই জন্মদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি। শুনতে অসম্ভব হলেও সত্যিই কিন্তু তাই ঘটেছে মেওয়া সিংয়ের পরিবারে। তাঁদের জন্ম সাল হলো যথাক্রমে ১৯৫৫, '৫৮, '৭৮, '৮২ ও '৮৪।

ছুটন্ত মোটরবাইকে যোগাসন

যোগাসন সকলে মাটিতে বসেই করেন। ডাঃ চন্দ্রগুপ্ত ধর্মাধিকারীর এটা পছন্দ নয়। তিনি চেয়েছিলেন নতুনত্ব। তাই চলন্ত মোটরবাইকের ওপর বসে তিনি যোগাসন করেন। তখন কিন্তু বাইকের হ্যান্ডেলের ওপর তাঁর হাত থাকে না। যোগাসন করতে করতেই তিনি ১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারেন একবারের জন্যও বিশ্রাম না নিয়ে। ডাঃ ধর্মাধিকারী থাকেন মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলার পরতওয়াদায়। ছোটবেলা থেকেই তিনি যোগাসন করতেন। মোটরবাইকে চেপে যোগাসন করা তিনি প্রথম দেখান ১৯৮৫ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে। সেদিন ১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে করতে তিনি ২২টি আসন করেন। এখন তিনি তাঁর ১০০ সিমি হিরো হন্ডা বাইকে চড়ে মোট ৩৮টি আসন করতে পারেন।

চুরি করল কে ?

বিংশ শতাব্দীর সবথেকে রোমহর্ষক ডাকাতি ঘটে ১৯০৭ সালে। আয়ারল্যান্ডের রাজকীয় রত্নালঙ্কার, যার মূল্য ২৫০,০০০ আমেরিকান ডলার, ডাবলিন প্রাসাদের বেডফোর্ড টাওয়ারের স্ট্রংরুম থেকে খোয়া যায় বলতে গেলে চারজন প্রহরীর চোখের সামনে থেকেই। ২৮ জুন থেকে ৬ জুলাইয়ের মধ্যে চোর টাওয়ারের প্রধান দরজার চাবি, স্ট্রংরুমের চাবি ও অলঙ্কার রাখা সিন্দুকের চাবি সংগ্রহ করে। অলঙ্কারগুলো বাক্স থেকে বের করতে চোরের নিশ্চয় ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লেগেছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু কারো কোনো সন্দেহ জাগেনি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড দীর্ঘ অনুসন্ধান করেও ব্যর্থ হয়। চোর ও চুরি যাওয়া রত্নালঙ্কারের হদিস আজ পর্যন্ত মেলেনি।

পেল্লায় ধোসা

আমেদাবাদের সংকল্প রেস্তোরাঁয় গেলে আশ মিটিয়ে তোমরা ধোসা খেতে পারবে। এখানে প্রতিদিন যে ধোসা বিক্রি হয় তার বড়টির সাইজ লম্বায় ৮ ফুট। দাম ? মাত্র ২০১ টাকা।

স্ট্যান্টম্যান

ক্যারাটে শিক্ষক রাজ শেঠি সাংঘাতিক সব কেরামতি দেখিয়ে থাকেন। একবার ৬০টি মোটর সাইকেল তাঁর বুক ও তলপেটের মধ্যবর্তী অংশের ওপর দিয়ে চালানো হয়। এগুলো ছিল ৩৫০ সি সি এনফিল্ড বুলেট মোটর সাইকেল। চালক, পিছনের আরোহী ও অন্যান্য জিনিসসমেত প্রতিটির ওজন ছিল ৯০০ পাউন্ড। সাইকেলগুলো তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে পর পর যেতে সময় নেয় ২ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।

পেন্ডার আইল্যান্ডের দানব

সিরিল অ্যানড্রুজ আর নরম্যান জর্জসান ভ্যাঙ্কুবারের অদূরে সাউথ পেন্ডার আইল্যান্ডে গিয়েছিলেন হাঁস শিকার করতে। দিনটা ছিল ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪। গুলিতে একটা হাঁস জখম হয়ে জলে পড়তেই দুজনে নৌকো নিয়ে ছুটে যান সেটাকে তুলে আনতে। কিন্তু পৌঁছবার আগেই জল থেকে উঠে আসে খয়েরি ছাই রং মেশানো, করাতের মতো দাঁত, ছুঁচলো জিব আর ঘোড়ার মতো মাথাওলা এক কদাকার দানব। তাঁদের বিস্ফারিত চোখের সামনেই সে হাঁসটাকে গিলে ফেলে জলে ডুব দেয়। তাড়াতাড়ি তীরে ফিরে অ্যানড্রুজ কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে ফোন করেন। তাঁরা এসে দেখেন ২০ গজ দূরে জলে প্রায় মাথা রেখে, লম্বা দেহটা ঢেউয়ের তালে তালে ওপর-নিচ করে দানবটা সাঁতার কাটছে। অ্যানড্রুজের মতে সেটা লম্বায় ছিল ৪০ ফুট, শরীরের সবথেকে স্ফীত অংশের ব্যাস ২ থেকে ৩ ফুট আর মাথাটা ছিল ৩ ফুট লম্বা।

ছবি : সুফি

ফ্রেডির জন্যে

আরতি বসু

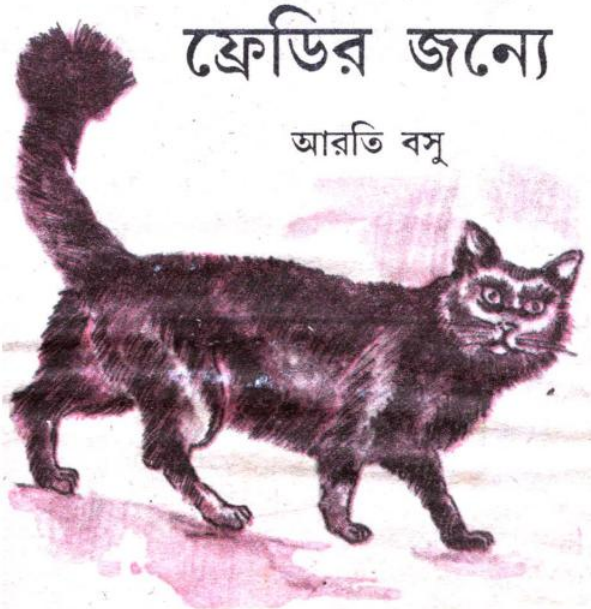

সাত সকালে মিসেস ক্যাম্পবেল কেন যে বাজারে এসে হাজির হয়েছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। একা মানুষ। কী-ই বা এমন খান যে বাজারে না এলেই চলছিল না। তবু এসেছেন, মানে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ আজ ঘুম ভাঙার পর থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল তাঁকে বাজারে যেতে হবে। যেতেই হবে। এক্ষুণি! নিজেকে নিজে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু না, কোনো যুক্তিই কাজে এলো না। মুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে সোজা চলে এলেন বাজারে।

দোকানপাট সবে খুলছে। ভেবেচিন্তে মিসেস ক্যাম্পবেল মুদিখানা থেকে কিছু কেনাকাটা করে নিলেন যাতে অন্তত দিন পনেরোর মধ্যে আর এ মুখো হতে না হয়। আধঘণ্টাটাক পর বাজার থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন মিসেস ক্যাম্পবেল। একটা প্রশ্ন তখনও তাঁর মনকে তোলপাড় করছে, কেন এসেছিলাম এখানে? বাজার করতে? না, তা তো নয়। তবে? তবে কেন এসেছিলাম? কেন? কেন? তবে কি.....

ম্যাডাম, একটু দাঁড়াবেন!

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল। মিসেস ক্যাম্পবেল দেখলেন, অল্পবয়সী একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর গাড়ির পাশে। মনে হচ্ছে ওরা যেন তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছে। বেশ একটু অবাক হলেন তিনি, এরা কারা? তাঁর কাছে এদের কী দরকার! ছেলেটি কিন্তু পরিচিতের মতো অকুণ্ঠিত ভাবে এগিয়ে এসে বলল, আপনি না চিনলেও আমরা আপনাকে চিনি। আমরা জানি আপনি বেড়াল ভালবাসেন। আমাদের একটা বেড়ালছানা আছে, নেবেন? আমরা তাকে খুবই ভালবাসি কিন্তু এখন তাকে আমাদের কাছে রাখার একটু অসুবিধে আছে। যদি আপনি দয়া করে ওকে নেন তাহলে আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকে না।

ছেলেটির খোলামেলা কথাবার্তা ভারি ভাল লাগল মিসেস ক্যাম্পবেলের। তাছাড়া তাঁর মনে কৌতূহল ও উত্তেজনার মৃদু শিহরন। হাতের ব্যাগ, প্যাকেট ইত্যাদি তাড়াতাড়ি গাড়িতে রেখে বললেন, কই দাও দেখি, কাকে দেবে। এবার একটা ছোট্ট বেতের ঝুড়ি এগিয়ে ধরল ওরা। ঝুড়িতে নরম কাপড়-চোপড়ের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে মাস দেড়েকের একটা বেড়ালছানা। সেটা বেড়াল, না কুচকুচে কালো পশমের একটা গোলা—বোঝা শক্ত। তারই মধ্যে ঝকমক করছে হলুদ রঙের দুটো চোখ। ঠিক যেন দুটো হলুদ রঙের পোখরাজ। দেখামাত্রই ছানাটাকে ভালবেসে ফেললেন মিসেস ক্যাম্পবেল। ছানাটাও তাঁর চোখে চোখ রেখে আহ্লাদে গরগর করে উঠল। তাকে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে মিসেস ক্যাম্পবেল বললেন, নেব বৈকি, নিশ্চয়ই নেব। তোমরা ভেব না। এ আমার কাছে খুব ভালো থাকবে। আর শোনো তোমরা কি নাম দিয়েছ জানি না, আমি কিন্তু একে ফ্রেডি বলে ডাকব।

গাড়ি চালাতে চালাতে মিসেস ক্যাম্পবেল এক একবার ফ্রেডিকে দেখে নিচ্ছিলেন। কেমন নিশ্চিন্তে ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছে! যেন কতকালের চেনা মনিবের সঙ্গে বেড়াতে বেড়িয়েছে। ভয়-তরাসের চিহ্নও নেই। তাঁর কিন্তু গোটা ব্যাপারটা এখনও খুব অদ্ভুত লাগছে। শুধু কাকতালীয় বলে কিছুতেই যেন উড়িয়ে দিতে পারছেন না। গতকাল সন্ধ্যায় বন্ধু জেনির কাছে যা শুনেছেন তা যদি না শুনতেন তাহলে কি আজ এত সহজে একে বুকে তুলে নিতে পারতেন? নাকি দেখামাত্রই এমন টান অনুভব করতেন? বোধহয় না। তাহলে? তাহলে কি সত্যিই তিনি এক অদৃশ্য শক্তির হাতের পুতুল!

পাঁচটা নয়, দশটা নয়, এমনকি দুটো তিনটেও নয়—মিসেস ক্যাম্পবেলের সারাক্ষণের সঙ্গী ছিল একটি মাত্র বেড়াল স্যাম। ঠিক বাঘের মতো ডোরাকাটা। ঠিক ঐরকম মেজাজী। সেই স্যাম হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেল। খোঁজ..খোঁজ....খোঁজ...গোটা হলিউড পাহাড় তোলপাড় করে ফেললেন মিসেস ক্যাম্পবেল তবু স্যামকে পাওয়া গেল না। ভয়ানক মুষড়ে পড়লেন তিনি। এমন সময় তাঁর পুরোনো বন্ধু জেনির সঙ্গে দেখা, যিনি গবেষণা করছেন প্যারা-সাইকোলজি নিয়ে। জেনী তাঁকে বললেন, ইচ্ছাশক্তি বলে একটা শক্তি সত্যি সত্যিই আছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। এই শক্তির চর্চা করলে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটানো যেতে পারে। এই বলে জেনি তাঁকে ধ্যান বা অভিনিবেশ করার একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। এর দ্বারা নাকি স্যামের সঙ্গে তাঁর মানসিক সংযোগ স্থাপিত হবে এবং স্যাম যদি বেঁচে থাকে তাহলে সে

নিশ্চয়ই ফিরে আসবে তাঁর কাছে। আর যদি সে বেঁচে না থাকে তাহলে ঠিক তার মতো কেউ একজন আসবেই তাঁর কাছে। কথাগুলো ঠিক বিশ্বাস হয়নি মিসেস ক্যাম্পবেলের। কিন্তু জেনি এত জোর দিয়ে বললেন যে একেবারে অগ্রাহ্য করতেও পারলেন না। স্যামকে ফিরে পাবার আশায় সন্দিগ্ধ মনেই কিছুক্ষণ অভিনিবেশ করলেন। পরদিন ভোরে হঠাৎ মনের মধ্যে বাজার যাবার তাগিদ আর সেখানেই এই কালোমানিক লাভ।

তা সে যাই হোক হারিয়ে যাওয়া স্যামের জায়গা জুড়ে বসল হঠাৎ পাওয়া ফ্রেডি। মায়া পড়ল আরও বেশি। কারণ ফ্রেডি যেন আরও নেটিপেটি। লেজটি তুলে সারক্ষণ পায়ে পায়ে ঘুরছে। লেজের ডগাটা আবার পাকানো বলের মতো। ছোটদের টুপিতে যেমন পশমের ঝুমকো বাঁধা থাকে অনেকটা সেই রকম। হয়তো ছোটবেলায় কোনোরকম চোট পেয়েছিল। মোট কথা সব মিলিয়ে ফ্রেডি একটা আহ্লাদী পুতুলের মতোই সুন্দর। যেমন আদর খেতে ভালবাসে তেমনি ভালবাসে গান শুনতে। এক এক সময় তো গান শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়ে মনিবের কোলের মধ্যে।

বাড়িতে লোকজন এলে ফ্রেডির খুব আনন্দ। মনিবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে সকলকে। তারপর সটান গিয়ে কোলে উঠে বসবে। তবে ফ্রেডির সবচেয়ে বেশি ভাব জেনির সঙ্গে। জেনির আসার খবরও যেন ও আগে থেকেই টের পেয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে উন্মুখ হয়ে। ওর ভাবগতিক দেখে মিসেস ক্যাম্পবেলও ইদানীং অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন। একটা কিছু রহস্য নিশ্চয়ই আছে তা নাহলে তিনি কেন একমুহূর্ত ফ্রেডিকে চোখের আড়াল করতে পারেন না? ফ্রেডিই বা কেন তাঁর ওপর এত নির্ভরশীল? একটা বেড়াল বই তো নয়!

পনেরোটা মাস ফ্রেডিকে নিয়ে পরম আনন্দে কাটালেন মিসেস ক্যাম্পবেল। এবার তাঁকে কিছুদিনের জন্য হলিউডের বাড়ি ছেড়ে বেরুতে হবে। প্রথমে যাবেন সান্টাক্রুজে। মেয়ের কাছে। সেখান থেকে ছেলের বাড়ি নিউ ইয়র্কে। অনেক দিন দেখেননি, মন টানছে। কিন্তু ফ্রেডিকে নিয়ে যদি সেখানে অসুবিধে হয়? মিসেস ক্যাম্পবেল তাই দু তিন মাসের জন্য তাকে জেনির কাছে রেখে যেতে চাইলেন। কিন্তু জেনির কুকুরটা তখন ভীষণ অসুস্থ। কাজেই তার পক্ষে ফ্রেডিকে রাখা সম্ভব হলো না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ফ্রেডি থাকবে ওঁদের আর এক বন্ধু মেরীর কাছে। মেরী ফ্রেডিরও বন্ধু। কিন্তু তাই বলে সে মনিবকে ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে তার সঙ্গে যাবে কেন? যাবে না, কিছুতেই যাবে না।

তবু যখন যেতেই হলো তখন ওর অস্থিরতায় সকলেরই চোখ ভিজে উঠেছে।

এরপর তিনটে সপ্তাহ মিসেস ক্যাম্পবেল কাটালেন সান্টাক্রুজে মেয়ের কাছে। ছেলেও ছুটি নিয়ে এসেছে। বোনের কাছে কয়েকটা

দিন কাটিয়ে মাকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক ফিরবে। ছুটিটা তিনজনেই উপভোগ করছিলেন প্রাণভরে। তবু তাঁর মধ্যেও ফ্রেডির জন্য মিসেস ক্যাম্পবেলের মনটা মাঝে মাঝে বড্ড ভারী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রাত্রে যখন চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায় তখন তিনি হিসাব করতে থাকেন কতদিন ফ্রেডিকে দেখেননি, আবার কতদিন পর দেখবেন। শেষে একদিন টিভি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠলেন, কেমন আছিস রে ফ্রেডি? ভালো অছিস তো? বলেই চমকে উঠলেন মিসেস ক্যাম্পবেল। ছিঃ ছিঃ! একি পাগলামি! ছেলে মেয়ে শুনলে ভাববে একটা বেড়ালের জন্যে মার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যে স্পষ্ট অনুভব করলেন ফ্রেডি এসে বসেছে তার কোলটিতে, আদরের প্রত্যাশায় মাথাটা গুঁজে দিয়েছে তাঁর চিবুকের তলায়।

পরদিন তাঁদের তিনজনেরই নিউ ইয়র্ক রওনা হওয়ার কথা। মিসেস ক্যাম্পবেল হঠাৎ সব ব্যবস্থা ওলটপালট করে দিয়ে বাড়ি ফিরে চললেন। কারণ কি? না, ফ্রেডির জন্য মন কেমন করছে।

মেরীর বাড়ির দরজা থেকেই ফ্রেডির নাম ধরে ডাক দিলেন মিসেস ক্যাম্পবেল। কিন্তু ফ্রেডির বদলে শুকনো মুখে বেরিয়ে এলেন মেরী। ফ্রেডি নাকি আসার পরের দিনই উধাও হয়ে গেছে। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিস পাওয়া যায়নি। উদ্‌ভ্রান্ত মিসেস ক্যাম্পবেল বাড়ি ফিরে ফোন করলেন জেনিকে। জেনি আবার সেই ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক সংযোগের কথা তুললেন। বিরক্ত হয়ে ফোন নামিয়ে রাখলেন মিসেস ক্যাম্পবেল। সেই রাতে ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। না, আর কোনো কিছুতেই তাঁর আপত্তি নেই। দৈব হোক, ভুতুড়ে হোক, বুজরুকি হোক—তাঁর ফ্রেডিকে ফিরে পাওয়া নিয়ে কথা।

পরদিন সন্ধ্যে ছটার সময় মেরীর বাড়িতে তিনজন মহিলা একসঙ্গে বসলেন। তাঁদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তির জোরে ফ্রেডিকে ফিরিয়ে আনবেন। মুহূর্তের জন্যও কেউ তখন নিজেকে নির্বোধ ভাবছেন না। ঘণ্টাখানেক একভাবে বসার পর ওঁরা উঠলেন। আশায় আশায় রাতটা কাটল। সকাল হলো, বেলা বাড়তে লাগল একটু একটু করে। হতাশায় ক্রমশ ভেঙে পড়ছেন মিসেস ক্যাম্পবেল। বেলা তখন এগারোটা... হঠাৎ তাঁর মনে একটা উৎসাহের জোয়ার এল। মেরীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটছেন....হাঁটছেন.....হাঁটছেন... শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন সরু একটা রাস্তায়। সম্ভবত কোনো বাড়ির নিজস্ব গলিপথ। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ফ্রেডি! ফ্রেডি! কোথায় তুই? এই দেখ আমি এসে গেছি। আয়। আয়। বার দুয়েক ডাকতেই বাড়ির জানালা খুলে মুখ বাড়ালেন এক মহিলা, বললেন, আপনি কি ঝুমকো লেজওলা একটা কালো বেড়ালকে খুঁজছেন? মিসেস ক্যাম্পবেলের শরীরে যেন বিদ্যুতের শিহরন। তিনি বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাকেই তো! সেকি আপনার কাছে আছে?

মহিলাটি এবার দৌড়ে বেরিয়ে এসে বললেন, আমার ছোট ছেলে ওকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে তুলে এনেছিল বাড়িতে। কত যত্ন করলাম তবু কিছুতেই থাকল না। তবে ও কিন্তু রোজ একবার করে খেতে আসে। অন্য সময় কোথায় যে লুকিয়ে থাকে কে জানে। ও যে ওর মনিবকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটা ওর হাবভাব দেখেই বুঝেছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা ওর গলায় আমাদেরই নাম ঠিকানা লেখা একটা কাগজ ঝুলিয়ে দিয়েছি। ওকে এভাবে ফেলে যাওয়া কিন্তু আপনার ভারি অন্যায় হয়েছে।

নিশ্চয় হয়েছে, একশ বার অন্যায় হয়েছে। এমন ভুল আর কক্ষণো হবে না। অসঙ্কোচে নিজের দোষ স্বীকার করলেন মিসেস ক্যাম্পবেল.

সেদিন বিকেলেই ফ্রেডিকে ফিরে পেলেন মিসেস ক্যাম্পবেল। রোগা, দুর্বল, দু চার পা যায় আর টলে পড়ে। হলুদ চোখ দুটোও যেন পাঁশুটে হয়ে গেছে। মনিবকে দেখেও ঠিক ভরসা করতে পারছে না, বিশ্বাস করতে পারছে না। ওকে বুকে তুলে নিলেন মিসেস ক্যাম্পবেল, তারপর অসংখ্য বার শুধু একই কথা বলে গেলেন, এমন আর কক্ষণো হবে না রে ফ্রেডি! কক্ষণো না! কক্ষণো না... কক্ষণো না..... শুনতে শুনতে ফ্রেডি যেন তার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। বাড়ি ফিরে চেনা কার্পেটটার ওপর শোয়া মাত্রই পরম নিশ্চিন্ততায় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুমন্ত ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মিসেস ক্যাম্পবেল হঠাৎ বুঝতে পারলেন জেনি যে অতীন্দ্রিয় শক্তিটার কথা বারবার বলে সেই শক্তিটার আসল নাম হলো ভালোবাসা।

[এসি ক্যাম্পবেলের 'ই.এস.পি.,ফ্রেডি অ্যান্ড মি' অবলম্বনে।]

ছবি : প্রণবকুমার হাজরা

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং কামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

আপনার জীবনের স্বপ্ন ভাসে ওর উজ্জ্বল চোখে।
আর ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যত আপনারই হাতে!

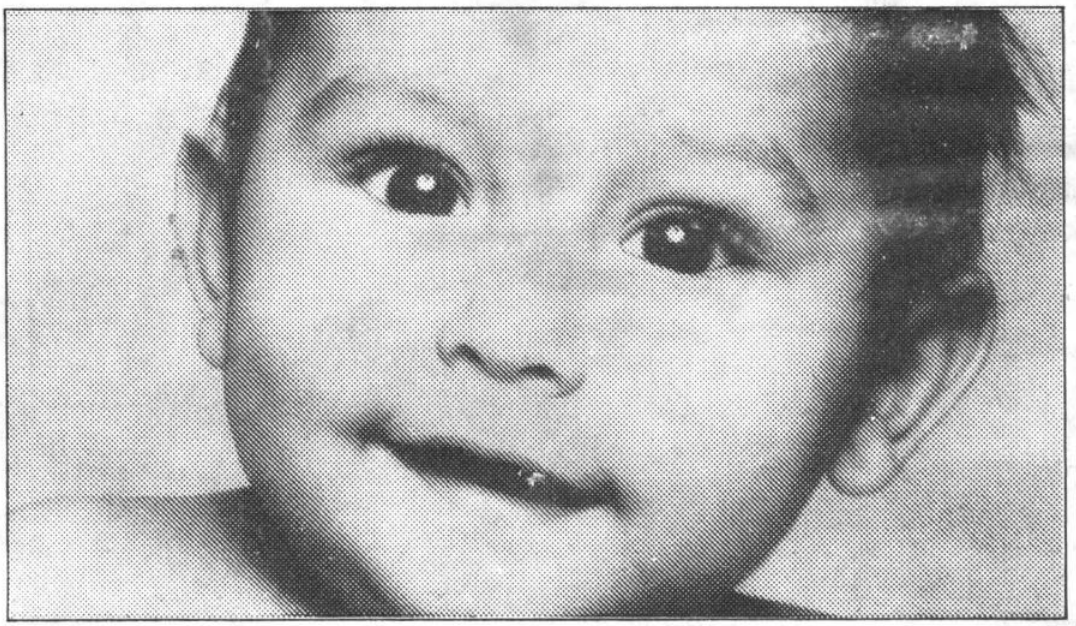

শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি।

আপনার বুকভরা ভালবাসার মতই
এটি বাড়ছে, আর বাড়ছে, আর বাড়ছে।

আহা, ওর জন্যে আপনার কত স্নেহমমতা! ওর প্রতিটি প্রয়োজন মেটান নিখুঁত যত্নে। দিনরাত প্রতি মুহূর্তে ও কত নিশ্চিন্ত বোধ করে। আর এটাই কি ওর ভবিষ্যত নিয়ে ভাবার সঠিক সময় নয়? আজ সামান্য একটু পরিকল্পনা করে ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলুন। আপনি হয়তো ভাবছেন কোন আশ্চর্য চাবিকাঠিতে। ভাল কথা, আমরা তো সেইজন্যেই আছি। আমাদের শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধির দৌলতে। যেটির সুযোগে আপনি একথোকে একবারেই বিনিয়োগ করতে পারেন। অথবা প্রতি বছরে কিছু করে টাকা। তারপর দেখুন আপনার গচ্ছিত টাকা কেমন কেবল বাড়ে আর বাড়ে, ওর 21 বছর বয়স অবধি। এবং ও হয় লাখপতি। ভাবুন তো, এই উপহার ওর জীবনে কত উপকারে আসতে পারে। হয় তো এটি ওর উচ্চ শিক্ষার পথ খুলে দেবে। অথবা ওর নিজস্ব একটি ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করবে। কিংবা, সে নিজস্ব একটি ছোট্ট বাড়িও কিনতে পারবে। ওর 18 বছর বয়স হলে ও বছরে দু'বার টাকা তুলতে পারবে। আর বাকী টাকাটা ওর 21 বছর বয়স অবধি একনাগাড়ে বেড়ে যাবে। শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি। একদিন আপনার সন্তানই আপনার পরিকল্পনার জন্য ঐকান্তিক ধন্যবাদ জানাবে।

14% ডিভিডেণ্ড!
বোনাস প্রতি
3 বছরে!

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া
আপনার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য

কর্পোরেট কার্য্যালয়ঃ ১৩, স্যার ভিঠলদাস থ্যাকারসে মার্গ (নিউ মেরিন লাইন্স) বোম্বাই ৪০০ ০২০, ফোন-২০৬৮৪৬৮ **জোনাল কার্য্যালয়ঃ** ২ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন-২২০ ৫৩২২ **শাখা কার্য্যালয়ঃ** আশানিবাস, ২৪৬ লুইস রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪, ফোন-৫৬১৪১ ● ২ ও ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন-২২০ ৯৩৯১ ● ৩য় অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ২য় তল, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩ ২১৬ ফোন-৮১০২ ● জীবনদীপ, এম এল নেহরু রোড, পানবাজার, গৌহাটি ৭৮১ ০০১, ফোন-৫৪৩১৩১, ● ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বিল্ডিং, মেইন রোড, বিস্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১ ০০১ ফোন-২৫৫০৮ ● জীবনদীপ, একজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১, ফোন-২২ ২৪৭০ জীবনদীপ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ৪০১

সব সিকিওরিটি বিনিয়োগেই বাজারগত ঝুঁকি রয়েছে। বিনিয়োগের পূর্বে আপনার বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা বা এজেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন।

Sista's-UTI-213/93/BEN

চুল পড়া ? অকালপক্কতা ? খুস্কি ?

চুল নিয়ে সমস্যা ?

এগুলি চুলের কোন রোগই নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই সমাধানের জন্য মাথায় লাগানোর ওষুধের সঙ্গে সঠিক খাওয়ার ওষুধেরও প্রয়োজন।

.... ডাঃ সরকার

খুস্কি বিহীন, ঘন, কালো, মসৃণ চুল যদি চান, **আর্ণিকাপ্লাস** লাগান আর **ট্রায়োফার** খান। এ দুটি চুল পড়া বন্ধ করে, চুলের পুষ্টি জোগায়, অকালপক্কতা রোধ করে, মাথার খুস্কি তাড়ায়। মাথা ঠাণ্ডা রাখে, পেটের গোলমাল সারায়, চুলের উপাদান বাড়ায়, তাই নতুন চুল গজায়। রূপ হয় অপরূপ হোমিওপ্যাথির ছোঁয়ায়, আর সুফল ছাড়া, কোনও কুফল না হয়।

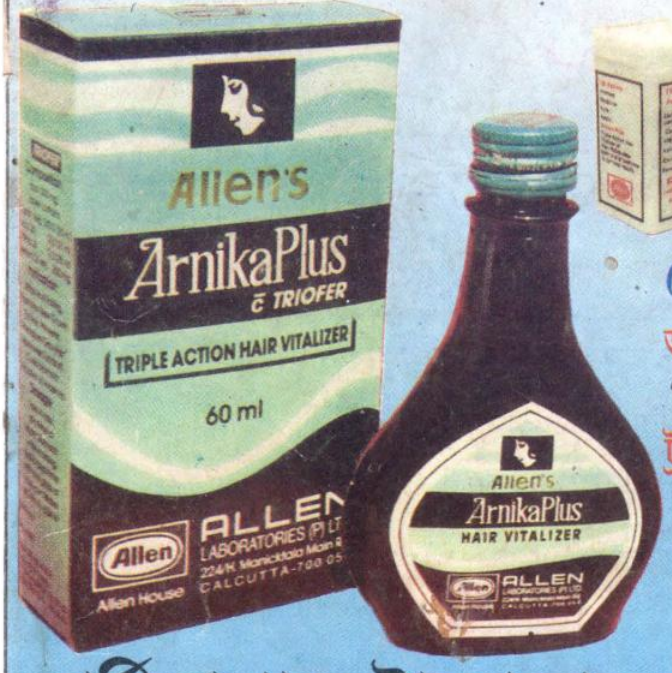

বিশ্বে সর্বপ্রথম

কেশ সমস্যা সমাধানে

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার—

"**আর্ণিকাপ্লাস**-তেলবিহীন হেয়ার লোশন ও **ট্রায়োফার** ট্যাবলেট-হোমিও হেয়ার টনিক" একই অভিনব প্যাকে।

প্যাক: ৬০ মিলি ও ১০০ মিলি।

ব্যবহার বিধি:
প্যাকের ভিতর দ্রষ্টব্য।

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপল্ অ্যাক্শন্ হেয়ার ভাইট্যালাইজার

কেশ সমস্যা সমাধানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হোমিও ওষুধ

লিভোসিন নির্মাতাদের
সহযোগী সংস্থা Allen -এর
হোমিও গবেষণার একটি উপহার।

এ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ
এ্যালেন হাউস ঃ কলি-৫৪, ফোন ঃ ৩৬-৩০৯৬
এ্যালেন ভবন ঃ কলি-৫৯ ফোন ঃ ৫৯-৪০৫১

Jupiter
Emars Allen
allen's india
Dr. Sarkar Group

অ্যালোপ্যাথিক
আয়ুর্বেদিক
হোমিওপ্যাথিক
ওষুধ প্রস্তুতকারক

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

Marketed by :
allen's india **Allen's India Marketing Pvt. Ltd.**
ArnikaPlus Apartment, Sealdah
35, A. P. C. Road, Calcutta-9
Phone : 350-9026
Allen Apt : 351-0062

Allen's Ad. India